পার্বত্য তথ্য কোষ

২

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার সরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -২

ইতিহাস

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই ঃ পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক ঃ আতিকুর রহমান

প্রকাশক ঃ পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ ঃ বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং ঃ আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর ঃ বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
ঃ মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক ঃ ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগে ঃ আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১৯৬১২৭২৪৮

পার্বত্য তথ্য কোষ
খণ্ড -২ ইতিহাস ঐতিহ্য

বিষয় সূচী ঃ

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় আধিপত্য, দেশবাসীর কাছে সন্দেহজনক বিষয়। এর একটি আপোষ রফা অবশ্য কর্তব্য। অপত্তিজনক ও উত্তেজনাকর হলেও বাঙ্গালী জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা ইতিমধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেছে। বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধি উপজাতিদের কাছে যতই অপ্রীতিকর হোক, এবং তাদের প্রত্যাহারের দাবীতে যতই জঙ্গী আন্দোলন ও চাপ সৃষ্টি হয়ে থাক, বাঙ্গালী হটান এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। সরকারী আদেশ নিষেধ বিতাড়ন আর বিপক্ষীয় জঙ্গী কার্যক্রম ইত্যাদি কিছুই বাঙ্গালী উচ্ছেদে সক্ষম হবে না। তারা এক পথে যাবে, অন্য পথে ফিরে আসবে। স্বভূমে সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের অর্থ যদি হয় মোটা অংকের ক্ষতি পুরণ দান ও পূনর্বাসন, তাহলেও এ পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। সবাই আগ্রহ ভরে এক পথে নিস্ক্রান্ত হবে। টাকা কড়ি জায়গা জমি হজম করে, ছদ্মবেশে নতুন জায়গায় এসে আবার বসত গড়ে নিবে। কারণ এতদাঞ্চল ভৌগোলিকভাবে দেশের সাথে অখন্ড। এই অঞ্চলকে দেয়াল-বন্দি-বিচ্ছিন্ন-নিষিদ্ধ রাখা যাবে না। ব্যবসা, বিনিয়োগ, চাকুরী, শ্রম ইত্যাদি কর্মসংস্থানমূলক কাজের সুত্র অবারিত, তাই এতদাঞ্চলে বাঙ্গালীদের আসা যাওয়া নিচ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আলো বাতাসের মত এতদাঞ্চলে স্বদেশীদের আগমন নির্গমন ব্যাপারটিও প্রতিরোধযোগ্য নয়। এতএব এ প্রশ্নে আপোষ রফাই বিধেয়। সংবিধান সম্মত সম অধিকার ও গণতন্ত্রই হতে পারে সে আপোষরফার সুত্র। খোদ জন সংহতি সমিতি, গণতন্ত্রকে চর্চনীয় করে ঘোষণা দিয়েছে।

"(জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ) চায় অতি দ্রুত গতিতে সকল প্রকারের পশ্চাদ পদতার অবসানকল্পে সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে শামিল হতে।" (সুত্রঃ জরুরী বিবৃতি তাং ৩১.১২.৯১) তবে এই সমাধান সুত্রে তাদের এই আশংকাটিও জরুরী বিবেচ্য যে, বাঙ্গালীদের অবাধ প্রবেশাধিকার ও বসবাস নিয়ন্ত্রণ করা না হলে, উপজাতীয়দের জাতীয় সংহতি পরিচিতি, অস্তিত্ব ও ভিটা মাটির অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ জন্য হাল পর্যন্ত একটি সময় বেধেঁ দেয়া দরকার, যার পর বহিরাগতদের কাছে সহনীয় পরিমাণ ছাড়া জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। জন সংহতি সমিতি এই ছাড় মেনে নিয়ে, হাল পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের উপর থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নিলে, বিতাড়ন ও উচ্ছেদ নয়, জমি হস্তান্তর ও বহিরাগমন নিয়ন্ত্রন সম্ভব। এটি হবে পালনযোগ্য বাস্তব আপোষ রফা। এই আপোষের ভিত্তিতে সুযোগ সুবিধায় সমতা প্রবর্তন এবং নিয়োগ নির্বাচনে অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণ আইন প্রত্যাহারসহ বৈষম্যহীন ব্যবস্থা পালনীয় হবে। তবে পশ্চাদপদ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মিয়াদ ভিত্তিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ হবে প্রাপ্য। শাসন প্রশাসনের ভিত্তি হবে অবাধ গণতন্ত্র। স্থানীয় শাসন বা স্বায়ত্ত শাসনের সাংবিধানিক পদ্ধতি হবে অনুকরনীয়। পরাধীন আমলের স্থানীয় আইন ও সামন্ত ব্যবস্থা অবশ্যই বর্জনীয়। এগুলো পশ্চাদপদতার অবলম্বন এবং ঔপনিবেশিক ও বটে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা পোষণ যোগ্য নয়।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

পার্বত্য তথ্য কোষ-২

ইতিহাস

আঞ্চলিক ইতিকথাঃ

১৮৬০ সালের আগে, এই পর্বতাঞ্চল ছিলো চট্টগ্রামেরই অংশ এবং একই জেলা প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। তাই এতদাঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস চট্টগ্রামেরই ইতিহাস, পৃথক কিছু নয়। এখানে অতীত ও বর্তমানের ইতিহাসের বর্ণনাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা ছাড়া এতদাঞ্চলীয় স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যাবে না। এই বিবেচনায় স্থানীয় ঐতিহাসিক বর্ণনাকে অতীত ও বর্তমানে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হলো।

১। অতীত বিবরণ

চট্টগ্রাম ও তার পূর্ববর্তী পর্বতাঞ্চল, দুই প্রাচীন স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত থাকায়, হামেশাই উত্তর ও দক্ষিণের এ দুই রাজ্য কর্তৃক আক্রান্ত ও অংশতঃ বিজিত হয়েছে। দখল প্রতিযোগিতার এই ক্ষেত্রটিকে নিরঙ্কুশ ও দীর্ঘস্থায়ী অধিকারে রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এই দখল প্রতিযোগীতায় স্বাধীন বাংলার মুসলিম রাজশক্তি ও শরীক হয়েছে।

অতীত কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক বীর রাজা ৫৯ খ্রীঃ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাকে পরাজিত করে রাঙ্গামাটিতে তার রাজধানী স্থাপন করেন। জনশ্রুতি হলো পার্বত্য ত্রিপুরার জনৈক রাজা কিলে ও মংলে নামিয়ে দুই ভাইকে মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণে বসবাসকারী রিয়াংদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করে নিযুক্ত করেন। এই দুই কাহিনী সন্দেহজনক গল্প কথা। তথ্যগত বিচারে তা টিকে না। বর্তমান রাঙ্গামাটির পত্তন হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রয়াত চাকমা রাজা জব্বার খানের মাধ্যমে, যিনি জায়গাটিকে বিশ্রাম বিনোদন, তহসিল কার্যালয় ও কৃষি খামার রূপে গড়ে তোলার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে সর্বপ্রথম পছন্দ করেন। ১৮৬৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন ঐ রাজকীয় কাছারী ঘরে স্বীয় সদর দপ্তর স্থাপন করেন। ১৮৭৩ সালে চাকমা রাজ দপ্তরটি নিকটবর্তী বালুখালিতে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে চাকমা রাজকীয় আনুকূল্য, আর সরকারী উৎসাহে, আশপাশে কিছু কৃষি খামার ও জনবসতি গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় কোন রাঙ্গামাটির এতদাঞ্চলের কোথাও থাকার কথা কোন বিবরণে নেই। গিরি পদবিধারী কোন রাজ পুরুষের ত্রিপুরার প্রচলিত ইতিহাসে স্বীকৃতি নেই। মূলতঃ তাদের পদবী ফা, যা মুসলিম আমলে মানিক্য খেতাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে চাকমা রাজ নামের সাথে সামঞ্জস্য শীল বিজয় মানিক্য আর উদয় মানিক্য নামীয়

দুই রাজ পুরুষ ত্রিপুরার ইতিহাসে রাজারূপে বর্ণিত হয়েছেন।

আরাকানের ইতিহাস সুত্রে জানা যায়, সুলত ইঙ্গ চন্দ্র নামীয় তথাকার জনৈক রাজা ৯৫৩ খ্রীঃ সালে জনৈক সুরতানকে তাড়া করে চট্টগ্রামের কুমিরা পর্যন্ত অঞ্চল দখল করে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। তৎপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। গল্প আর শ্রুতি কথা ভিত্তিক কিছু কাহিনী এর মধ্যে শোনা গেলেও তা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে ১২৪০ খ্রীঃ সনে ত্রিপুরা কর্তৃক চট্টগ্রামের কিয়দাংশ বিজিত হয়। পরে বাংলার মুসলিম সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯) চট্টগ্রামে স্বীয় দখল সম্প্রসারন করেন। অসমর্থিত তথ্য সুত্রে জানা যায়, উত্তর আরাকানের চাকমা প্রধান মৈসাং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিযোগে তথাকার মগরাজা কর্তৃক আক্রান্ত ও বিতাড়িত হয়ে মুসলিম শাসনাধীন আলীকদম অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারই স্মারক একটি লোকগীতি এখনো চাকমা সমাজে গীত হয়। যথাঃ

‘এলে মৈসাং লালচ নেই

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই

চল ভেই লোগ চল যেই

চম্পক নগর ফিরি যেই। ইত্যাদি’

ঐ ঘটনায় বিতাড়িত চামকাগণ আলীকদম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিংবদন্তিমূলক কাহিনী থেকে জানা যায়ঃ আরাকান রাজ মেংদির মন্ত্রী ছাং গ্রাই ১৩৩৩ সালে চাকমা অঞ্চল মইসা গিরি আক্রমণ করে, চাকমা প্রধান অরুণযুগ, তদীয় তিন সহধর্মিনী, তিন পুত্র, দুই কন্যা, এবং দশ হাজার সাধারণ চাকমাকে বন্দী করেন। বন্দী দুই চাকমা রাজকন্যার জ্যেষ্ঠাকে রাজা নিজে এবং দ্বিতীয় জনকে জনৈক মন্ত্রীবিবাহ করেন। বন্দী চাকমা প্রজাগণ দৈংনাক নামে ইয়ংক্ষ্যং নামক স্থানে বসবাসের অনুমতি পায়। রাজা মেংদির অন্যত্র ব্যস্ততা থাকাকালে এক সময় তিন বন্দী চাকমা রাজপুত্রই উত্তরের পাহাড়ী মংজামু অঞ্চলে পালিয়ে যান। কনিষ্ঠ রাজপুত্র শক্রজিতের ঔরশে রাজা মৈসাং এর জন্ম। তারই নেতৃত্বে মগ অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাকমারা আলীকদম অঞ্চল ও তার আশে-পাশে স্থানান্তর গ্রহণ করে, যা ছিলো তখন মুসলিশ শাসিত অঞ্চল। এই কাহিনী সুত্রেও প্রমাণিত হয়, উত্তর আরাকানের একাংশ সেই অতীতেও চাকমা অধ্যুষিত ছিলো। যে অঞ্চলটি মাতামুহুরী ও নাফের উৎস অঞ্চল থেকে বেশী দূরে নয়। ইয়ংক্ষ্যং ও মংজামু নামক জায়গা হুবহু ও সামান্য বিকৃত পরিচয়ে ঐ সীমান্ত অঞ্চলে আছে বলে জানা যায়।

১৩৩৯ খ্রীঃ সালে সোনার গাঁর সুলতান ফখরোদ্দিন মোবারক শাহ্ আরাকানীদের বিতাড়িত করে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। সে থেকে সার্বিকভাবে কখনো এটা মুসলিম শাসন থেকে মুক্ত হয়নি। মাঝে মধ্যে আরাকানী মগ ও ত্রিপুরা রাজশক্তি অংশতঃ এতদাঞ্চল জয় ও শাসন করেছেন, তবু অনুমান ঃ অংশ বিশেষে

বশ্যতা রূপে মুসলিম শাসন ও বজায় ছিলো। ঐ অবস্থানকে অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী মগ ও ত্রিপুরাদের পরাজিত করে মুসলিম শক্তি বারবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে মোগল পূর্ববর্তীকালের সুলতান ও তাদের শাসন কালের তালিকা প্রদত্ত হলো, যাঁরা এতদাঞ্চল জয় ও শাসনের সাথে জড়িত ছিলেন। যথা ঃ

১। সুলতান ফখরোদ্দিন মোবারক শাহ	১৩৪০-৫০ খ্রীঃ
২। এখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ	১৩৫০-৫২ খ্রীঃ
৩। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	১৩৫২-৫৮ খ্রীঃ
৪। সিকান্দার শাহ	১৩৫৮-৫৯ খ্রীঃ
৫। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ	১৩৫৯-১৪০৯ খ্রীঃ
৬। সাইফ উদ্দিন হামজা শাহ	১৪০৯-১২ খ্রীঃ
৭। শেহাব উদ্দিন বায়েজিদ শাহ	১৪১২-১৪ খ্রীঃ
৮। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	১৪১৪-০০ খ্রীঃ
৯। জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ	১৪১৫-১৬ খ্রীঃ/ দ্বিতীয় মেয়াদ ১৪১৯-৩২ খ্রীঃ
১০। শামসুদ্দিন আহম্মদ শাহ	১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ

আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের পর ১৪১৫ সালে বাংলার রাজ ক্ষমতা সাময়িক জনৈক হিন্দু সামন্ত গনেশ ওরফে দনুজ মর্দনের হস্তগত হয়। তৎপর তার দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র দেব কিছু দিনের জন্য ক্ষমতাসীন হোন। তার প্রথম পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ পূর্বক প্রথম ও দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করার মধ্যবর্তী তিন বছর গোলযোগপূর্ণ হিন্দু শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ঐ সময়টিতেও চট্টগ্রামে বাঙলার সুলতানী ও রাজকীয় শাসন অব্যাহত ছিলো।

১৪০৬ সালে বার্মা রাজ সোয়া মাংজি আরাকান দখল করেন ও তথাকার রাজা নর মিখলা বাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হোন। ১৪৩০ সালে রাজা নররমিখলার সহায়তায় ওয়ালী খান নামীয় জনৈক সেনাপতিকে সুলতান জালালুদ্দিন চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান করে নিযুক্ত করেন। তিনি তথায় উপস্থিত হয়ে, স্বীয় নিয়োগকর্তা গৌড় সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে ১৪৩২ সালে তাকে দমাতে ও নর মিখলার পক্ষে আরাকানে অভিযান চালাতে পৃথক সেনাপতি ও আরেক দল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। তাতে বিদ্রোহী ওয়ালী খান নিহত ও আরাকান বিজিত হয়ে তথাকার সিংহাসনে নরমিখলা প্রতিষ্ঠিত হোন। তখন সীমান্তবর্তী কিছু আরাকানী অঞ্চল বাংলার সাথে

যুক্ত করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে দুই রাজ্যের মাঝে মনোমালিন্য ঘটে। ফলে নর মিখলার পরবর্তী রাজা মাংখারি ওরফে আলী খান, আক্রমণ করে, রামু পর্যন্ত অঞ্চলে দখল সম্প্রসারণ এবং সুলতান কর্তৃক পুনর্বাসিত চাকমাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। তৎপর ঐ সীমান্ত অঞ্চলটি পুনরোদ্ধারের পক্ষে অবিলম্বে সুলতানের পক্ষ থেকে আর কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায়, তা দীর্ঘদিন নির্বিবাদে আরাকানী দখলাধীন থাকে। অতঃপর ইলিয়াস শাহী সুলতান রোকনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৬) নিজ রাজত্বের শেষ দিকে অঞ্চলটি পুনর্দখল করেন। তবে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) পুনরায় ঐ বিতর্কিত অঞ্চলটি স্বল্প সময়ের জন্য আরাকানী রাজার দখলাধীন হয়। কিন্তু ঐ অপ্রত্যাশিত আরাকানী দখলকে অনুসরণ করে গৌড়ীয় অভিযান অনিবার্য হয়ে উঠে। সুলতান পুত্র নছরত শাহের অধীন পরাগল খাঁ কর্তৃক ঐ আক্রমণ পরিচারিত হয় এবং বিজয় শেষে ঐ পরাগল খাঁই তথাকার সামরিক শাসন কর্তা নিযুক্ত হোন। পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছোটি খাঁন, আরাকানীদের দ্রুততার সাথে সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দেন এবং ত্রিপুরাদেরও উত্তরাঞ্চল থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হোন। এতদসত্ত্বেও আরাকান অধিপতি রাজা বসপিয়ে ওরফে কলিমা শাহ একদা কর্ণফুলি পর্যন্ত অঞ্চল রোসাং রাজ্যাধীন করে নেন। মেং দৌলিয়া ওরফে মোকো শাহের আমলে মধ্য চট্টগ্রামের মগ অধিকৃত অঞ্চলের সামন্ত শাসক ছিলেন জনৈক জয় চন্দ্র। পাটিয়ার চক্রশালায় তার সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিলো। অবশিষ্ট চট্টগ্রামে নিম্নোক্ত সুলতানদের অধীনে মুসলিম শাসন অব্যাহত ছিলো। যথাঃ

১। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৪৩৩-৪৯ খ্রীঃ
২। রুকনউদ্দিন বরবক শাহ	১৪৪৯-৭৬ খ্রীঃ
৩। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ	১৪৭৬-৮১ খ্রীঃ
৪। সিকান্দার শাহ	১৪৮১-৮৭ খ্রীঃ
৫। শাহজাদা (হাবসী)	১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ
৬। সাইফুদ্দিন ফিরোজশাহ	১৪৮৮-৯০ খ্রীঃ
৭। কুতুবউদ্দিন মাহমুদ শাহ	১৪৯০-৯৩ খ্রী
৮। শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহ	১৪৯৩-০০ খ্রীঃ
৯। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ
১০। নসরত শাহ	১৫১৯-৩২ খ্রীঃ
১১। আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ	১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ

১২। গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩-৩৮ খ্রীঃ

১৩। শের শাহের পক্ষে নিজাম খাঁ সুর ১৫৩৮-৫৩ খ্রীঃ

১৪। শামসুদ্দিন মোহাম্মদ গাজি ১৫৫৫৩-৫৬ খ্রীঃ

১৫। সুলেমান কাররানী ১৫৫৬-৭২ খ্রীঃ

১৬। দাউদ কাররানী ১৫৭২-৭৬ খ্রীঃ

১৭। জামাল খাঁ পন্নী ১৫৭৬-৮০ খ্রীঃ

সুলতান জালাল খাঁ পন্নীর নিকট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চল ত্রিপুরাগণ এবং দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানীরা দখল করে নেন। এই আরাকানী দখলের কাল হলোঃ ১৫৮০ থেকে ১৬৬৬ পর্যন্ত ৮৬ বছর দীর্ঘ। ত্রিপুরা পরে দখল থেকে উত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানীরা ছিনিয়ে নেয়। সেখানে ত্রিপুরা দখলের স্থায়িত্বকাল হলো ১৫৫৬-৬৯ তথা ১৪ বছর। ঐ মগ দখল থেকে ১৬৬৬ সালে মোগলরাই প্রথমে শঙ্খ নদী পর্যন্ত অঞ্চল এবং পরের ৯০ বছরে ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল মুক্ত করেন।

মোগল আমলে চট্টগ্রামের প্রশাসন নিম্নোক্ত নয়টি চাকলায় বিভক্ত ছিলো যথাঃ

১। নিজাম পুর ২। ভাটিয়ারী ৩। আওরঙ্গাবাদ ৪। নোয়াপাড়া ৫। রাঙ্গুনিয়া ৬। চক্রশালা ৭। দোহাজারী ৮। বাঁশখালী ও ৯। দেয়াং

আরাকানী শাসনে দক্ষিণ চট্টগ্রাম চারভাগে বিভক্ত ছিলো। যথা ঃ রামু, চকোরিয়া, চক্রশালা ও দেয়াং। ত্রিপুরা কাহিনী রাজমালার মতে তথাকার রাজা ধন্য মানিক্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৫১৫ সালে আরাকানে অভিযান চালান। আরাকানী রাজা মীনজায়া ১৫১৮ সালে কিছু এলাকা পুনরদখল করেন। ঐ একই সনে চাকমা প্রধান চনুই আরাকানী মগ রাজার নিকট আত্মসর্পণ করেন। ১৫২০ সালে জনৈক চাকমা রাজকন্যাকে মগ রাজা বিবাহ করেন এবং ঐ জামাতা কর্তৃক চাকমা প্রধান কুপ্রু উপাধিতে ভূষিত হোন। ১৫২২ সালে ত্রিপুরা রাজ কিছু এলাকা নিজ দখলে আনেন, কিন্তু তা ১৫৩১ সালে আরাকান রাজ মীনবিন ওরফে জেবোক শাহ কর্তৃক পুনরবিজিত হয়। ত্রিপুরা রাজ বিজয় মানিক্য (১৫৪০-৭১) চট্টগ্রামের কিছু অঞ্চল ছিনিয়ে নেন। পরবর্তী রাজা অমর মানিক্য (১৫৭৭-৮৬) আরাকানীদের হাতে পরাজিত হোন এবং ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত তাদের পদানত হয়। বিজয়ী আরাকানী রাজা মেং ফালং ওরফে সিকন্দর শাহ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে মোগল বাদশাহ আকবরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকালীন বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেন। তখন বাংলায় বিশৃঙ্খলাবস্থা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠান শক্তি মোগলদের দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত। মেং ফালং (১৫৭১-৯৩) চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার এক বিরাট এলাকা নিজ দখলাধীন করেন। তার পুত্র মেং খামং ওরফে হোসেন শাহ

(১৬১২-২২) বাংলায় আরো অভিযান চালান। আরাকানী রাজা এতদাঞ্চলকে শাসন করার জন্য নিজের জনৈক ভাই অথবা ছেলেকে নিযুক্ত করেন। আরাকানী রাজা মেং রাজাগ্যি, আরবী আরাকানী ও দেব নাগরী এই ত্রয়ী ভাষায় নিজের আরাকানী ও মুসলিম নামসহ ১৬০১ সালে মুদ্রাজারি করেন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীকাল চট্টগ্রাম আরাকানী দখলধীন থাকে। ১৬৬৬ সালে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আদেশে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান, আরাকানী অধিকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। সে পর্যন্ত ফেনী নদী ছিলো মোগলদের অধীন সুবে বাংলার শেষ দক্ষিণ সীমান্ত। সুবেদার পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ঐ অভিযানে চট্টগ্রামের শঙ্খ নদী তীর পর্যন্ত মোগল অধিকার সম্প্রসারিত হয়। এবং আরাকানী অভিযান সর্বকালের জন্য দক্ষিণ দিকে গুটিয়ে যেতে শুরু করে। নাফ নদী পর্যন্ত বাকি দক্ষিণাংশে মোগল অভিযান ও চাপ অব্যাহত রাখা হয়। তাতে কিছু কিছু এলাকা উদ্ধার পেতে থাকে। এভাবে পরবর্তী নব্বই বছরে নাফ নদী পর্যন্ত গোটা দক্ষিণাঞ্চলের উদ্ধার সমাপ্ত হয়। এই পর্যায়ে স্থায়ীভাবে ত্রিপুরাও আরাকানী অধিকার থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুক্তি ঘটে। নাফ নদী ও চীন পর্বতমালা হয় দক্ষিণ পূর্বের সীমান্ত। উত্তরে ফেনী আর পূর্বে ঠেকা নদী ত্রিপুরা ও লুসাই সীমান্তে পরিণত হয়। এরপর বৃটিশ আমলের শুরু পর্যন্ত এতদাঞ্চল আরাকানী ও ত্রিপুরা আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। মোগল শক্তি পতনোন্মুখ হওয়ায় তার আক্রমণ শক্তি হ্রাস পায়। রাজ্য রক্ষা ও শৃঙ্খলা বিধানেই তার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেবই এই অঞ্চলের নাম রাখেন ইসলামাবাদ এবং ঠেকা সীমান্তের পাহাড়টি পরিচিত হয়, শাহী দখলের স্মারক রূপে শাহীচল নামে, যা বর্তমানে শাইচল অভিহিত।

আরাকানী রাজশক্তির সাথে মোগলদের চলমান যুদ্ধকালে ১৭১১ সালে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে এক ক্ষুদ্র উপজাতীয় সামন্ত চন্দন খান আরাকানী রাজার আনুগত্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। তার বংশধরগণের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ মোগল আনুগত্য মেনে কর দানে চুক্তিবদ্ধ হোন, কিন্তু তিনি অবশেষে ১৭২৪ সালে কর দানে বিরত হোন ও বিদ্রোহ করেন। তাতে দোহাজারী ঘাটির মোগল ফৌজদার কৃষণ চাঁদ তাকে আক্রমণ ও আরাকানে বিতাড়ণসহ তার লোকজনের আবাদি ও বাড়ীঘর ধ্বংস করে দেন। এর ১৩ বছর পর ১৭৩৭ সালে দ্বিতীয় আরাকানী উপজাতীয় সর্দার শের মস্ত খান স্বপক্ষ ত্যাগ করে চট্টগ্রামের মোগল নায়েব জুলকদর খানের শরণাপন্ন হোন। তিনি রাঙ্গুনিয়ার কোদালা উপত্যকায় কিছু পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি এবং জুম কর আদায়ের তহসিলদারী লাভ করেন। এই বন্দোবস্তি সুত্রে কিছু সাধারণ চাকমা তাঁর খামার আবাদে নিয়োজিত হয়। এই প্রথম কিছু চাকমার আরাকান ও দক্ষিণাঞ্চল ত্যাগ এবং উত্তরের দিকে আগমন ও বসবাসের সুত্রপাত ঘটে। ইতোপূর্বে মগদের অত্যাচারে বিতাড়িত চাকমাগণ মাতামুহুরী ও নাফ উপত্যকায় পুনর্বাসিত হলেও তথাকার মুসলিম শাসনের বিলোপ ঘটায় সম্ভবতঃ বাধ্য হয়ে তাদেরকে মগ আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। তারা পুনরায় রোসাং রাজ্যবাসী আরাকানী নাগরিকে পরিণত

হোন। নাফ নদী পর্যন্ত মোগল শাসনের সম্প্রসারণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, দীর্ঘ অন্তরবর্তী যুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত আরাকানী অধিবাসীদের অনেকে ওপারে স্থানান্তর গ্রহণ করে। চামমাদেরও সে দলে থাকা সম্ভব।

অতঃপর ১৭৬০ সালে নবাব মীর কাশিম আলী খানের আদেশে মেদিনী পুর ও চব্বিশ পরগনাসহ চট্টগ্রাম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ সালে মোগল বাদশাহ শাহ আলম কর্তৃক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ও নেজামত হস্তান্তরিত হলে, এতদাঞ্চল পুরাপুরি বৃটিশ প্রশাসনের অধীন হয়ে যায়। শুরু হয় বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল। পরে ১৮৬০ সালে এক্ট নং ২২ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হয়।

চট্টগ্রামের পার্বত্য পূর্বাঞ্চল তখন দুর্গম বনময় ও জনবিরল এলাকা। কুকি ত্রিপুরা ও মগ সম্প্রদায়ভুক্ত জুমিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক মাত্র তথায় জুম চাষ ও যাযাবর জীবন-যাপন করতো। স্থায়ী কৃষিজীবী না হওয়ায় তাদের বসবাস ছিলো জুমিয়া সুলভ ভ্রাম্যমান। এই সম্প্রদায়গুলোর মূল পিতৃভূমি ছিলো পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা মিজোরাম ও আরাকান। এতদাঞ্চলসহ ঐ অঞ্চলগুলো অবিচ্ছিন্ন বন ও পাহাড়ের সমষ্টি হওয়ায়, ভ্রাম্যমান জুম কৃষির সুবাদে ও রাষ্ট্রীয় সীমান্তে বাঁধার অভাবে জুমিয়ারা এপারে ওপারে অবাধে পারাপার করতো। এই বিচারে তারা ছিলো মুক্ত নাগরিক। তারা নিজেদের সর্দার ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনতায় আবদ্ধ ছিলো না। নিজেদের আবাস ক্ষেত্রকে তারা মুক্তাঞ্চল ভাবতো । বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিলো তাদের ধারণাতীত। এই অবাধ জীবন চর্চায় কোন প্রতিরোধ বা বাঁধা উপস্থিত হলে বিশেষতঃ কুকি সমষ্টি তাকে রুখে দাঁড়াতো, এবং অপারগ হলে, স্থান ত্যাগ করতো।

পাহাড় ও.বনের বিচ্ছিন্ন স্বাধীন চেতা জুমিয়া জনগোষ্ঠীকে মূল কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা ও যায় না, তাই তারা উপজাতি আখ্যায়িত। উপজাতীয়রা কোন নির্দিষ্ট জাতি নয়, সাধারণ মানব শাখাবোধক সংজ্ঞা এটি। এই স্বাধীন ভ্রাম্যমান উপজাতীয়দের সাধারণতঃ নির্বিবাদে থাকতে দেওয়া হতো। তাদের সর্দারদেরও সম্মান করা হতো। বিনিময়ে ঐ সব উপজাতীয় ও তাদের সর্দারগণ, উপহার নজরানা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নগদ অর্থ কড়ি বা উপঢৌকন স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধিদের প্রদান করে, পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সুসম্পর্ক রচনায় ব্রতী হতো। গড়ে ওঠা এই প্রথা ঐতিহ্য বৃটিশ আমলেও বর্তায়। তারা স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা ছিলো না। একমাত্র শের মস্ত খাঁ ব্যতীত কোন উপজাতিরই সরকার থেকে ভূমি বন্দোবস্তি গ্রহণের কোন নজির নেই। অথচ সীমান্তের শাহীচল পর্বতমালা (অপভ্রংশ শাইচল) ঠেকা কূলের গোরস্থান মৌজা ও আলীকদম ইত্যাদি নামগুলো প্রমাণ করে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই মুসলিম শাসনাধীন ছিলো। তবে স্বাধীন ও পূর্বের মুক্তাঞ্চলীয় উপজাতিদের চলাচল ও জুম চাষে বাঁধা দেয়া হতো না। বিনিময়ে তাদেরকে তুলা চাষে উৎসাহিত

এবং তা সরবরাহে চুক্তিবদ্ধ আর তাদের সর্দারদের তজ্জন্য জিম্মাদার করা হতো। জুম চাষের জন্য অবশ্য তাদেরকে কর ও দিতে হতো। এই গোটা ব্যবস্থাই ছিলো অস্থায়ী জুম নোয়াবাদ নামে খ্যাত। যেহেতু কোন জুমিয়াই এতদাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলো না। চাষাবাদ শেষে নিজেদের মুক্তাঞ্চলে ফিরে যতো। সেহেতু সরকারের সাথে অস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ জুমিয়াদের পরিচয় ও স্থায়ীত্ব নির্দিষ্ট ছিলো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ হলহেড ১৮২৯ সালে এ মন্তব্য করেন যে, The hill tribes were not British subjects but merely tributories and that we recognised no right on our part to interfare with their internal arrangement.

(Ref : Statistical Account of Bangal vol VI Page 22 by W. W. Hunter)

(বাংলা ঃ পাহাড়ী উপজাতিরা বৃটিশ প্রজা নয়, বড়জোর উপঢৌকন বা কর দাতা লোক যে কারণে তাদের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থাদিতে হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে অনুমোদনীয় নয়।

(সূত্র ঃ ষ্টেটিষ্টিকেল একাউন্ট অফ বেঙ্গল খন্ড ৬ পৃঃ ২২ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার)।

এতদসত্ত্বেও পরবর্তীকালে বহিরাগত উপজাতিদের সবাইকে অবাধে ১/১৯০০ রেগুলেশন নামীয় আইন জারির মাধ্যমে তাদের পিতৃভূমির উল্লেখসহ এতদাঞ্চলে অভিবাবসন প্রদান এবং দেশীয় অধিবাসীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যথা ঃ পার্বত্য শাসন বিধি ধারা ৫১/৫২। তবে এটা ছিলো বৃটিশের ঔপনিবেশিক ও খ্রীষ্টীয় ধর্মীয় সম্প্রসারণবাদী স্বার্থে গৃহীত পদক্ষেপ। যদ্দরুণ তাদের পক্ষে আসাম ও আরাকান দখল সহজ হয়, এবং অনেক উপজাতি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা লাভ করে। এর আরেক প্রত্যক্ষ ফল হলো জনবিরল পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশী জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত থাকে। দেশী বিদেশী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলার এই চেষ্টায় বন সংরক্ষণ আইন এক্ট নং ৭ ধারা নং ২/১৮৬৫ খ্রীঃ অবহেলিত হয়, যে আইনের মাধ্যমে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই বন ঘোষিত হয়েছিলো।

মঘী অধিকারভুক্ত অবশিষ্ট দক্ষিণ চট্টগ্রামের শেষ আরাকানী শাসক কং হ্ল্যা প্রু, মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে ১৭৫৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু স্বদেশে তিনি নিন্দিত আর অপমানিত হোন। বৃটিশ আমল শুরুর পর ১৭৭৪ সালে তিনি কিছু অনুসারীসহ পুনরায় স্বদেশ ত্যাগ করে রামুর ঈদঘরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি হলেন দক্ষিণাঞ্চলীয় মগ সর্দার বোমাংদের পূর্ব পুরুষ।

১৭৭৬ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় চট্টগ্রামে চাকমা সর্দার শের দৌলত খান ও তদীয় জামাতা রনু খার নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা কুকি আর এক দল

বাঙ্গালীকে নিজেদের যোদ্ধাদলে অন্তর্ভুক্ত করেন। মনে হয় তখন চাকমা জনবলের স্বল্পতাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই উক্ত আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সংযুক্তি প্রয়োজনীয় ছিলো, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিলো সুদৃঢ়। উল্লেখিত বিদ্রোহটি দশ বছরকাল স্থায়ী হয়। দুর্গম বন ও পাহাড়ের কারণে, সরকারী দমন অভিযান সফল হয়নি। ফলে বিকল্প হিসাবে গোটা পর্বতাঞ্চলকে অবরোধ করা হয়। বন্ধ হয়ে যায় পণ্যের আদায় প্রদান ও লোক চলাচল। তাতে অভাব অসুবিধায় লোকেরা অতিষ্ঠ আর আভ্যন্তরীন অসন্তোষ ব্যাপক হয়ে ওঠে। বিরুদ্ধ জনমতের চাপে আর দুর্বলতা হেতু বিদ্রোহীরা দমে যেতে বাধ্য হোন। ইতোমধ্যে ১৭৮৩ সালে চাকমা সর্দার শের দৌলত খানের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হোন পুত্র জান বখশ খান। তিনি নিরুপায় হয়ে, গ্রেফতার এড়িয়ে কলকাতায় পৌছে, গভর্ণর জেনারেলের নিকট আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থণা করেন। তাতে এতদাঞ্চলে শান্তি ফিরে আসে ও সরকারী অবরোধ প্রত্যাহ্বিত হয়। এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে চাকমা প্রধানদের সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাতে চট্টগ্রাম সদরের কদম মোবারক এলাকায় বাড়ীর জন্য এবং কর্ণফুলী নদীর উত্তর পারে রাঙ্গুনিয়ার ইছামতি তীরে, রাজদপ্তর স্থাপনের জন্য জায়গা দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এ দুটি যথাক্রমে রাজাপুর ও রাজানগর নামধারণ করে। রাজা জান বখশ খাঁই এ দুটির পত্তনকারী ব্যক্তি। জানা যায়, রাজা ধরম বখশ খাঁর সময় ১৮১৮ সালে জনৈক ফাপ্রুর নেতৃত্বে আরাকান ত্যাগী প্রায় চার হাজার তঞ্চঙ্গ্যা নিজেদের শ্রম ও অর্থ কড়িতে রাজা পুরে একটি মনোরম রাজবাড়ী তৈরী করে দেয়। রাজানগরে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজবাড়ী অঞ্চলটি ও রাজ দপ্তর ছিলো সিলক উপত্যকা ভূক্ত কোদালার রাজ ভিলা ও শুক বিলাসে। মনে হয় রাজস্থলী ঐ তরফে শুকদেব নামীয় বন্দোবস্তির অন্যতম অংশ ছিলো। এলাকাটি ছিলো দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ও পূর্বাঞ্চলীয় পর্বতের দ্বারপ্রান্ত, যেখানে প্রত্যক্ষ সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ছিলো কঠিন। সুতরাং তা সরকারী চাপেই পরিত্যক্ত হয়। তারপর শুরু হয় অর্ধ শতাব্দীর অধিক স্থায়ী শান্তির যুগ। ইতোমধ্যে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক ১৭৮৪ সালে আরাকান দখলিভূত হয়ে গেছে। আরাকানের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উপজাতীয় বাসিন্দা যাদের ভিতর মগ ও চাকমারাই ছিলো প্রধান, দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাতে বার্মায় ও বৃটিশে তিক্ততা শুরু হয়। ঐ তিক্ততার ক্রম পরিণতি হলো ১৮২৪ সালের বার্মা বৃটিশ যুদ্ধ। তাতে আরাকান বিজিত হয়ে বৃটিশ ভারতের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। সৃষ্টি হয় বিদেশী উদ্বাস্তুদের এদেশে অভিবাসন গ্রহণের পরিবেশ। দেশী-বিদেশী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে গড়ে ওঠার পক্ষে বন সংরক্ষণ আইনটি ও অবহেলিত হয়, বস্তুত ঐ আইনের মাধ্যমে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই বন ঘোষিত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা মুলতঃ ৬৮৮২ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। তখন অধিকাংশ কক্সবাজার অঞ্চল ও লুসাই ভুক্ত দেমগ্রী অঞ্চলটি ও এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৮৬৫সালের এক্ট নং ৭ এর ধারা নং ২ বলে ৫৬৭০ বর্গ মাইল এলাকা বন ঘোষিত

হয়েছিল হয়, যা ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ খ্রীঃ সালের কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। পরে কক্সবাজার ও দেমাগ্রী বাদ দিয়ে ৫০৯৩ বর্গ মাইলের ভিতর পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনর গঠিত হয়। এই বন ঘোষনার আলোকে ধরা যায়, তখন পার্বত্য অঞ্চল নিশ্চয় বসতি বিরল ছিলো। (তথ্য সুত্র ঃ হিল ট্রাক্টস গেজেটিয়ার পৃষ্ঠা ঃ ১০৭)।

২। লোক আগমন নির্গমন ও বসতি বিস্তার

ক) সাধারণ বিবরণ ঃ

পূর্বে লুসাই মিজোরাম চীন পাহাড় ও আরাকান, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য, আর দক্ষিণে নাফ নদী, এই চতুঃ সীমানার মধ্যবর্তী ভূভাগই চট্টগ্রাম। এর পূর্বাংশ প্রাকৃতিকভাবে বনময় পাহাড়ী অঞ্চল, আর পশ্চিমাংশ প্রধানতঃ সমতল, তাই পূর্বাংশ পার্বত্য বিশেষণের দ্বারা আগেও চিহ্নিত ছিলো, এবং ১৮৬০ খ্রীঃ সালে প্রশাসনিক প্রয়োজনে স্বতন্ত্র জেলা হওয়ার পরেও তা পার্বত্য বিশেষণযুক্ত চট্টগ্রাম নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এই উভয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী। তবে বর্তমানে এই নাম পরিচয়টি সংকুচিত হয়ে, এলাকাটি অঞ্চল ভিত্তিক নাম সম্বলিত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন পার্বত্য জেলা আকারে তিন স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত।

উপজাতিদের পক্ষে দাবী উঠেছে, গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুম্মল্যান্ড নামে পরিচিত হবে, এবং তাঁর অবাঙ্গালী অধিবাসীরা হবে আদিবাসী জুম্মজাতি। এটা চট্টগ্রামী মৌলিকত্ব অস্বীকারমূলক ও ঐতিহ্য হানিকর প্রস্তাব। জেলা বিভক্তির কারণে অবাঙ্গালী জুমিয়া অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চল, সহসা অবাঙ্গালী প্রধান এলাকায় পরিণত হওয়ার এটা হলো রাজনৈতিক পরিণতি। আঞ্চলিক পরিষদ ও উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা লাভের বর্তমান দাবীর ভিত্তি হলো এই অক্ষুণ্ন অবাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

তবে পার্বত্য অবাঙ্গালী সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃটিশ সৃষ্ট কুত্রিম। জেলা ভাগ কালে পূর্ব পশ্চিমে সীমা রেখা টানা হলে, অথবা ফটিক ছড়ি, রাঙ্গুনিয়া রাউজান ও রামুর পূর্বাঞ্চলকে পার্বত্য জেলাভুক্ত করা হলে, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী জনসংখ্যায় ভারসাম্য রচিত হতো। সে লক্ষ্যে এখনো তা করা যায়, এবং তাই হতো উপজাতীয় বিদ্রোহ দমনের প্রশাসনিক উপায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সাথে সংযোজিত কোন পৃথক অঞ্চল বা উপনিবেশ নয়। এতদাঞ্চল কদাপিও স্বতন্ত্র অথবা পার্শবর্তী ত্রিপুরা বা আরাকানের ভৌগোলিক অংশ ছিলো না। অঞ্চলটি আংশিকভাবে কখনো ত্রিপুরা, আর কখনো আরাকানের দ্বারা বিজিত হয়েছে। তবু কদাপিও ত্রিপুরা বা আরাকানে পরিণত হয়নি। বিজেতা জনগোষ্ঠী, বিজয়ের সুযোগে সাময়িক বসতি স্থাপন করেছে, আবার পরাজয়ে প্রত্যাহৃত হয়েছে। তাই এতদাঞ্চলে ত্রিপুরা ও মগ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় বাঙ্গালীদের তুলনায় হাশেমাই অস্থানীয় সংখ্যালঘু ছিলো এবং আছে। তবে চাকমা সম্প্রদায়ের এতদাঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিপুলভাবে মেরুকরণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

চট্টগ্রাম নামীয় অবিভক্ত এই ভৌগোলিক অঞ্চলে যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বহুভাষী জাতি গোষ্ঠী ভুক্ত লোকের আগমন নির্গমন ও বসতি স্থাপনের ঘটনা ঘটেছে। সেই বহিরাগতদের অধিকাংশ চট্টগ্রামী মূলের লোকদের সাথে একাকার হয়েও গেছে। তাদের পৃথক পরিচিতি অবশিষ্ট নেই। তবে কিছু ক্ষুদ্র অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, যা তাদের সাথে স্থানীয় লোকদের বিরোধ সংঘাতের কারণ। ভারত তাড়িত বিহারী ও অন্যান্য মুসলমান জনগোষ্ঠী, ঐ স্বতন্ত্রদের অন্যতম। তারা নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য হীনতার কারণে অংশতঃ বর্তমানে পর্যুদস্ত।

বহিরাগত জনগোষ্ঠীদের মাঝে সর্বাধিক ভাগ্যবান হলো উপজাতিরা, যারা পার্বত্য অধিবাসী। তারা বতমানে এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। অধিকন্তু সীমান্তবর্তী এমন বিজাতীয় অঞ্চল পাশাপাশি যেখানে তাদের সমর্থক, স্বপক্ষীয় লোকেরা ক্ষমতাসীন ও শক্তিধর। যে কোন বিপদে ও বিপর্যয়ে সেই শক্তি তাদের প্রতি মদদগার ও বটে। এই অবস্থানগত সুবিধার গুণে, তারা বিদ্রোহ করেও, আত্মরক্ষায় সমর্থ। দুর্গম পার্বত্য পরিবেশও তাদের সহায়ক।

মানুষের আগমন নির্গমন, বসতি স্থাপন, উন্নতি ও বিপর্যয় জ্ঞাপক। লোকজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অনেক পিছিয়ে আছে। বিভিন্ন রূপকথা, কিংবদন্তি আর অপতথ্যের আবর্জনায় প্রকৃত তথ্য তলিয়ে আছে, উদ্ধারের প্রচেষ্টা ক্ষীণ। এই অবহেলায় তথ্যাদি ও ঐতিহাসিক উপাদানসমুহ লোপ পাচ্ছে। তাতে স্থানীয় অপতথ্য আর রূপকথাকেই, একমাত্র অতীত বিবরণরূপে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না।

স্থানীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও মৌলিকত্ব নির্ণয়ে, লোকজ কাহিনী, আচার-আচরণ ও লোক আগমন নির্গমনের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুত্র। রাজনৈতিক মর্যাদা আর অগ্রাধিকার নির্ণয়ের পক্ষে ও এ তথ্যাদি অপরিহার্য্য। মানুষের আদিবাস সংক্রান্ত কৌলিন্য, আর সংখ্যা গরিষ্ঠতা হলো, অগ্রাধিকার দাবী ও শক্তির প্রধান উৎস। পার্বত্য-চট্টগ্রামে উপতাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তার সাথে আদিবাস যুক্ত হলে, তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দাবী হবে আরো দুর্দমনীয়। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের ফলে, এখন তাদের তুলনায়, স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি উপজাতি সংখ্যালঘু। কিন্তু এখনো তারা যৌগিকভাবে সংঘ্যাগরিষ্ঠ, এবং আঞ্চলিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টায়, জুম্মল্যান্ডের নামে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবীতে উচ্চকন্ঠ। এই বিপক্ষতা মোকাবেলার একমাত্র উপায় হলো উপজাতীয় বসতি অঞ্চলকে মুক্ত রেখে, জাতীয় সম্পত্তি বন ও পাহাড়ে জাতীয় জনতার বসতি বিস্তার, খাস পাহাড় ও বনে উপজাতীয় অবাধ অধিকার প্রত্যাখ্যান। এবং এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করা যে আসলেই উপজাতীয়রা স্থানীয় অদিঅধিবাসী নয়, বহিরাগত অভিবাসী, যাদের স্থানীয়ভাবে সতন্ত্র দেশ ও জাতি সত্তা প্রতিষ্ঠার দাবি গ্রহণ যোগ্য নয়। তাদের বাঙ্গালী হটানোর দাবীটি যৌক্তিক নয়। আসলে বাঙ্গালীরাই বাংলাদেশের আদিবাসীন্দা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের স্বদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধীয় অঞ্চল ও নয়। এর বসতিমুক্ত বৃহদাংশ খাস ও জাতীয়

সম্পত্তি। পার্বত্য জনসংহতি সমিতিও স্বীয় দাবী নামার ২(৫-ক) ও ২(৫-খ)তে এই বাস্তবতার কথা স্বীকার করেছে। যথা ঃ

২(৫-ক) । কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেত বুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত, অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা, এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ, অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

২(৫-খ)। কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা। (সূত্র ঃ পাঁচ দফা দাবী নামা)

স্মর্তব্য যে, বন পাহাড় ও হ্রদ, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণভুক্ত অঞ্চল, সুতরাং মুক্ত। বন আইন ও আবগারী আইনে, বন ও পাহাড় রাষ্ট্রীয় এলাকা রূপে ঘোষিত। এটা অধিগ্রহণের সমান।

এটি চুক্তিভুক্ত মীমাংসাও বটে যথাঃ পার্বত্য চুক্তি দফা নং খ/২৬ ও পরিষদ আইন ৬৪।

আরাকানী রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্র ৯৫৩ খ্রীঃ সালে জনৈক সুরতানকে তাড়িয়ে চট্টগ্রামের কুমিরা অঞ্চলের কাউনিয়া ছড়া পর্যন্ত এলাকা দখল ও সেখানে চিৎ তৌৎগোং লেখা সম্বলিত একটি বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। আমার ধারণা ঃ সে লেখাটি কোন মঘী বাক্য নয়, চিটাগাং নাম সম্বলিত বিজয় স্মারক। এটি চিটাগাং নামের প্রাচীনত্বের প্রমাণসূত্র।

এই নামটির সাথে যুক্ত আছে দেশী বাংলা শব্দ চিটা ও গাঙ। প্রথমটির অর্থঃ গুড়ের বর্জ্য তরল অংশ, এবং দ্বিতীয়টির অর্থ নদী। এই উভয় শব্দই স্থানীয় নাম পরিচিতি নির্ণয়ের পক্ষে যোগ্য। অপর সম্ভাবনা হলো ঃ প্রথম শব্দটি চিতা অথবা সীতা, যেগুলোর অর্থঃ শবদাহ কুন্ড ও দেবী সীতা। এগুলোকেও নাম পরিচিতির সুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। এই বাংলা নাম শব্দের সুত্রে বলা যায়, কর্ণফুলী শঙ্খ ও মাতা মুহুরী নদী বিধৌত এই অঞ্চলটির প্রধান বাসিন্দা আদি জনগোষ্ঠী ছিলো অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষী এবং তাদের ধর্ম সমাজ ও সভ্যতা প্রাচীন ভারতীয়। যারা গুড় ভক্ষণ, শবদাহ ও দেবী পূজায় অভ্যস্ত ছিলেন। তবে এই সূত্রটি অন্যান্য সমাজ সভ্যতা ধর্ম ও ভাষাভাষী লোকদের সহাবস্থানকে অস্বীকার করে না। স্থানীয় ইতিহাস ও শব্দ বৈচিত্র্যই সাক্ষ্য দেয়, অতীতে এতদাঞ্চলে কিছু অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু ছিলো। তাদের ভাষা ও রক্তগত সংমিশ্রণ, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সমাজে সংযোজিত হয়েছে।

সম্ভবত ঃ চট্টগ্রাম উপকূলে দশম শতাব্দীতে আরবী বনিকদের আধিপত্য ছিলো। আরাকানী রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্র তাড়িত সুরতানকে, তাই সুলতান জ্ঞান করা যায়, যার অর্থ রাজা। কথিত সুরতান শব্দটি, আরবী সুলতান খেতাবের মঘী অপভ্রংশ বা বিকৃতি হবে। এ ধারণার বিকল্প না থাকলে, এটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য থাকার

একটি তথ্য সূত্র বলেই মান্য।

ইতিহাস বলে প্রথম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও তৎ সন্নিহিত দ্বীপাঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম সভ্যতা ও দখল সম্প্রসারিত হয়েছিলো। তখন অনেক ভারতীয় সে সব অঞ্চলে স্থানান্তর গ্রহণ করেন। সেই প্রাচীন কালে নৌপথ সহজ ও নিরাপদ যাতায়াতের মাধ্যমে ছিলো না, তাই স্থল পথেই যাতায়াত হতো বেশি। সহজতম স্থলপথ ছিলো চট্টগ্রামের উপকূল। এই যাতায়াত পথে অভিযাত্রী জনগোষ্ঠী ভুক্ত লোকদের কারো কারো বসতি স্থাপন করাও সম্ভব।

শারীরিক রূপ গঠন ও সাজ পোশাকের বিচারেও দেখা যায়, এই অঞ্চলের অধিকাংশ সাধারণ লোক বোচা গঠন, শ্যামলা রং ও খাটো সাজ পোশাকের অধিকারী। পুরুষদের পরিধেয় হলো ঃ লুঙ্গি, গামছা, ফতুয়া, আর মেয়েদের পরিধেয় ঃ উপরে নীচে খন্ডিত পৃথক কাপড়। রূপার হাচুলী বাজুবন্দ, খাড়ু ও মালাই প্রধান অলংকার। পাহাড়ী বাঙ্গালী নির্বিশেষে অধিকাংশ সাধারণ স্থানীয় লোকের এই বাহ্যরূপ, তাদের বিভিন্ন মূল থেকে মিশ্রণের মাধ্যমে উদ্ভুত হওয়ার লক্ষণ। সামাজিক ও রক্তগত মিশ্রণ ধারায় এমনটি হওয়া সম্ভব। বিপরীতে দেখা যায়, এতদাঞ্চলের অল্প সংখ্যক লোকই ধার গঠন ও উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট আর্য্য শ্রেণীভুক্ত, এবং বোচা গঠন ও গোরা রং বিশিষ্ট মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোকেরাও সংখ্যায় অত্যল্প। এই সামগ্রিক জনসমষ্টির কারো মাঝেই অবিশ্রিম রং গঠন অবশিষ্ট নেই। বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও গোষ্ঠী ভুক্ত লোকেরা একত্রে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আর্য্য দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের সংমিশ্রণজাত জনগোষ্ঠী হলো চট্টগ্রামীরা। অবশিষ্ট বাংলাদেশী বাঙ্গালীরাও তা থেকে মুক্ত নয়। তবে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে তিব্বতী বর্মী ও ইউরোপীয় বংশোদ্ভুতদেরও অস্তিত্ব আছে, যে কারণে গোরা ও উজ্জ্বল রং, এবং বোচা ও ধার গঠন বিশিষ্ট লোক এই অঞ্চলে বেশী লক্ষ্যনীয়।

খৃষ্ট পূর্ব কালেই বহিরাঞ্চলবাসী অধিকাংশ আর্য্য ও মঙ্গোলীয়দের আগমন ও বসতি বিস্তার ঘটেছে। রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন উপলক্ষে যে আগমন নির্গমন ও প্রাধান্য বিস্তারের সূত্রপাত, তা বাহ্যতঃ খৃষ্টাব্দ শুরুর পরের ঘটনা।

প্রায় দেড় হাজার বছর খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভারতে আর্য্য আগমণ ঘটে, এবং তাদের দ্বারা মূল ভারতীয় অধিবাসী দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তাড়িত হয়, যারা দক্ষিণ ভারতে ও পূর্বাঞ্চলভুক্ত বাংলার সমতলে এসে বসতি গড়ে। তাদের একাংশ আরো পূর্ব-দক্ষিণে অগ্রসর হয়। প্রায় একই সময়কালে মঙ্গোলীয় জনস্রোত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। তারা হিমালয় পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে, পূর্ব ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের আগমনে দ্রাবিড়ীয় প্রাচীন ভারতীয়দের পূর্ব যাত্রা বাধার সম্মুখীন হয়। এই আর্য্য ও মঙ্গোলীয় বিপরীত জনস্রোতে মধ্যাঞ্চল বাংলা ও আরাকানে তাদের অবস্থান স্থির হয়ে যেতে বাধ্য হয়। দিগ্বিজয় ও ধর্মবিস্তার সুত্রে পরবর্তীকালেও বহিরাগমন ও বসতি বিস্তারের ঘটনা ঘটেছে। তাতে আরবী ইরানী, তুর্কী, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, বর্মী ও আরাকানী ইত্যাদি জনগোষ্ঠী বাংলার আনাচে-কানাচে, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে

অবাধে অভিবাসন গ্রহণ করে। স্থানীয়দের সমষ্টিগত অধিকার চেতনার অভাব, ও ভূমি প্রাচুর্য্যের কারণে, অতীতে কখনো বাগিরাগমনকে বাধা দেয়া হয়নি। কেবল রাজা বাদশাদের দিগ্বিজয়ই জয়ী বা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সমষ্টিগত অধিকার চেতনা, আধুনিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ফল, যা অতীতে চিন্তনীয় ছিলো না।

আর্য্য মঙ্গোলীয় জনস্রোত স্থিতি লাভ করার পর, সহস্রাধিক বছর বাদে পুনরায় হিন্দুদের ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ অভিযানে, ভারতীয় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী উৎপীড়নের শিকার হয়। তারা বিপুল সংখ্যায় বাস্তুত্যাগ করে, ধাবিত হয় দক্ষিণ পূর্বের বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে। চট্টগ্রামের পাহাড় ও বনে তাদের অনেকেই আশ্রয় নেয়, এবং অনেকে আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে যায়। সম্ভবতঃ চাকমারাও ঐ বিতাড়নের শিকার হয়ে, উত্তর বিহার অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে ও আরাকানে পৌছে স্থিতি লাভ করে। হয়তো অত্যাচারী হিন্দু মগধবাসীদের ঘৃণা করেই চাকমাদের মাঝে উচ্চারিত হয় কটুবাক্যঃ মগধামুয়া, অর্থাৎ মঘদ বাসীর মতো মুখ। এই বাক্যটি ঘৃণা অর্থে ব্যবহার্য্য। এদের মগধবাসের আরো দৃষ্টান্ত হলো, তাদের ভাষা ও উচ্চারণ হিন্দী মাঘধী ঘেষা, যথা ঃ লোগ (লোক) আমি (বহুবচনঃ হামের অপভ্রংশ) ংগে, ংগা আদ্রক, আজু ভাজি ইত্যাদি।

মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম বিস্তারের দ্বারা ও একদল লোকের কেউ কেউ দেশান্তরিত আর অনেকে পুনর্বাসিত হয়ে, লোকসংখ্যায় যোগ-বিয়োগ ঘটিয়েছেন। বাংলায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠার অভিযানে, পূর্ববর্তী ভুঁইয়া পাঠান ও সুলতানী শাসক গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারীরা উৎখাতের শিকার হোন। তাদের অনেকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ আশ্রয়েরই স্মারক হয়ে আছে : ইসাখালি, ইসামতি, কিল্লামুরা, বন্দুক ডাঙ্গা ইত্যাদি বসতি ও নদীর নাম পরিচয়। পাহাড়ী সমাজে প্রাপ্ত খান, দেওয়ান, খিশা ইত্যাদি পদবিগুলো সে আমলেরই লোক মিশ্রণজনিত মুসলিম উপাদান রূপে অবশিষ্ট আছে বলে অনুমান করা যায়। চাকমা মহিলা সমাজে বি আকারে বিবি পদবির ব্যাপক প্রচলন এই ইঙ্গিত দানই করে যে, মুসলমানদের দ্বারা তারা বিপুলভাবে মিশ্রিত ও প্রভাবিত হয়ে ছিলেন। এই সূত্রে মেয়ে পুরুষদের খান দেওয়ান খিশা (খেঁশা) ওবি উপাধি লাভ ও পরিচয় গ্রহণ সম্ভব বলেই ধারণা করা যায়।

চাকমা ভাষার শব্দবলীর বিপুল ভাবে ইসলামী ভাবাপন্ন হওয়া বিস্ময় সূচক। এটি পৌত্তলিকতা বর্জিত মুসলিম গৃহকোণের ভাষা, যথাঃ সালাম, কবুল, আরাম, হারাম, খোদা, ওক্ত, দোজখ ইত্যাদি। অতীতে খতনা করা ও দাড়ি রাখার মুসলিম রীতি ও তাদের অনেকের মাঝে প্রচলিত থাকার কথা, গোত্রীর নাম চেককাবা ও দাজ্যার মাঝে সুপ্ত আছে। চেককাবা মানে খতনাকৃত আর দাজ্যা মানে দাড়িওলা।

রাজ্য বিস্তার, ধর্মান্তর ও আক্রমণজনিত কারণেই, অতীতের অধিকাংশ লোক স্রোত ও দেশান্তরের ঘটনা ঘটেছে। এবং ঐ ঘটনাবলী শুরু হয়েছে প্রধানতঃ ভারতের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল থেকে। এই লোক প্রবাহটি ছিলো প্রধানতঃ পূর্ব-দক্ষিণমুখী। আক্রমণ তাড়িত লোকজনের প্রথম আশ্রয়স্থল হয়েছে বাংলার বন্যা প্লাবিত সমতল অঞ্চল এবং শেষ

আশ্রয়স্থল দক্ষিণ পূর্বের দুর্গম পাহাড় শ্রেণী। আর্য্যদের তাড়না, শক হুনদের আক্রমণ, গ্রীক আগ্রাসন, মঙ্গোলীয় চড়াও, মুসলিম শক্তির সম্প্রসারণ, হিন্দুদের বৌদ্ধ নিপীড়ন, বর্গী নামীয় মারাঠীদের অগ্রাভিযান, ইংরেজদের বিদ্রোহ-দমন কার্যক্রম ইত্যাদি, উত্তর ভারত ও পশ্চিম-উত্তর বাংলায় ব্যাপক ভয়-ভীতি ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাতে ব্যাপক সংখ্যক নিরিহ সাধারণ মানুষ, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বাস্তুত্যাগ করে, নিরাপদ অঞ্চলের দিকে ধাবমান হয়েছে। মারাঠী নিপীড়ণের কথা এখনো ছড়ার আকারে এই অঞ্চলে চালু আছে, যথা ঃ

'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে

বুলবুলীতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিবো কিসে।'

এই নিপীড়ন ও অত্যাচারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো সমুদ্র বিধৌত উপকূল অঞ্চল। এখানে পতুর্গীজ ও আরাকানী জলদস্যুরা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ বলাৎকার ও দাসকরণের মত ব্যাপক দুষ্কর্ম চালাতো। এই অত্যাচারেরও স্মৃতি হয়ে আছে, আরাকানীদের মগ ও পর্তুগীজদের হার্মাদ নামকরণের মাঝে। এই উপকূলীয় অত্যাচারীদের ধাওয়ায়, অনেকে দুর্গম ও গভীর বনের পাহাড়ে, আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

অতীতে আরাকান ও চট্টগ্রামমুখী পাল্টা জনস্রোত ও একাধিকবার প্রবাহিত হয়েছে। ঢাকামুখী মঘী আক্রমণের স্মারক হয়ে আছে বর্তমান ঢাকা শহরের মগবাজার এলাকাটি। মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো ত্রিপুরা ও আরাকানী রাজশক্তির যুদ্ধক্ষেত্র। এই প্রতিযোগিতায় উভয়ের মাঝে প্রায়ই এতদাঞ্চলের দখলের হাত বদল হতো। এই যুদ্ধ ও বিজয় প্রতিযোগিতায় প্রথম মুসলিম শক্তির আবির্ভাব ঘটে ১৩৪০ খ্রীঃ সালে বাংলার সুলতান খফরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে। শেষে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মুসলিম দখল ও আধিপত্য একচ্ছত্র হয়ে ওঠে। এই দখল ও বিতাড়ন সুত্রে ত্রিপুরা ও মগ জনসাধারণের অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, এবং সে স্থলে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধিযোগ হয়। অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করেও মুসলমানে পরিণত হোন।

ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত আরাকানে রাজশক্তির পরিবর্তন, বাঙ্গালী ও মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৪০৬ খ্রীঃ সালে আরাকানের রাজা নর মিখলাকে উৎখাত করা হয়। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি সুলতান জালাল উদ্দীনের সামরিক সহায়তায় ১৪৩২ খ্রীঃ সালে স্বরাজ্য পুনর্দখল করেন। পুনরায় রাজ্যচ্যুতির আশংকায় তিনি স্বরাজ্যে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈনিক, আমলা ও পেশাজীবীদের সমাবেশ ঘটান। তখন এ দেশীয় কিছু শিক্ষিত ও সাধারণ লোকও ভাগ্যান্বেষণে ওদের সঙ্গী হোন। গড়ে ওঠে মুসলিম ও বাঙ্গালী উপনিবেশ। এই লোকজনের মাঝে স্থানীয় মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রচনা,

স্বপক্ষীয় জনশক্তি আমদানী ও বসতি বিস্তারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে শেখ নামীয় আরবী-ইরানী বণিকদের.মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে স্থানীয় দম্পত্য জাত বংশবৃদ্ধি ঘটে গেছে, যা মালয়, ইন্দোনেশিয়া হয়ে ফিলিপাইন পর্যন্ত নিস্তৃত। জানা যায়, আরাকানীরা শ-কে থ বলে, যদ্দরুণ তাদের উচ্চারণে শেখ হয়েছে থেক। আরাকানী রাজকবি আলাউল স্বীয় পদ্মাবতী কাব্যে, তখনকার মিশ্র লোকবসতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন, যথাঃ

'নানা দেশী নানা লোক - শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়া তলে
আরবী মিসরী শামী - তুর্কী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেকী সকলে।
লাহোরী মুলতানী সিন্ধী - কাশ্মীরী দক্ষিণী হিন্দী
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
অহপাই খোটান চারী - কর্ণালী মায়লা বারী
আচি কুচি কর্ণাটক বাসী।
বহু শেখ সৈয়দজাদা - মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু লামা জাতি।
আভাই বার্মা শ্যাম - ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি।'

এটাকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ধরা হলে, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আরাকানের রোসাং রাজ্য বহিরাগতদের উপনিবেশে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। ১৭৮৪ খ্রীঃ সালে বার্মার আভারাজ্য কর্তৃক আরাকান দখলিভুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫২ বছরকাল ম্রাকু রাজবংশীয়রা তাদের মঘী নাম উপাধির পাশাপাশি বিকল্প মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ করার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। আরাকানের আরো প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায় যে, সে দেশের, রাজারা ভারতীয় নাম ও উপাধিকারী সূর্যবংশীয় বা চন্দ্র বংশীয় লোক। তাদের রাজ্য ও রাজধানীগুলো পর্যন্ত ভারতীয় নাম ঐতিহ্য ধারণ করে পরিচিত হয়েছে ধান্যা ওয়াদী বা ধান্যবতী ও বৈশালী ইত্যাদিতে। রাজ পুরুষদের নাম উপাধিতে ও ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ থিরি থুমম্মা বা শ্রীসুধর্ম ও নরপতি গ্যি বা নরপতি গিরি ইত্যাদি। বর্ণিত ম্রাকু রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নর মিখলার মুসলিম পরিচিতি হলো ঃ সুলেমান খাঁ। এই রাজারা তাদের মুদ্রায় ইসলামী কলিমাও উৎকীর্ণ

করেছেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ সালে মোগল সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খাঁ প্রথমে শঙ্খ নদীর তীর পর্যন্ত উত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানী দখল থেকে মুক্ত করেন। পরবর্তী নব্বই বছরে নাফ নদীর তীর পর্যন্ত অবশিষ্ট দক্ষিণ চট্টগ্রাম, মোগল অধিকারে আসে। বিতাড়িত হোন শেষ আরাকানী শাসক কংহ্লাপ্রু। সম্ভবতঃ এই মুসলিম অগ্রাভিযানকালে, বাংলা ভাষাভাষী আরাকানী জনগোষ্ঠী চাকমারা, স্থানীয় শাসক শ্রেণী ও মগ অধিবাসীদের বিরাগভাজন হোন। সম্ভত মোগল অনুগত লোক জ্ঞানে, তাদের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ফলে তাদের অনেকে স্বদেশ ত্যাগ করে, মোগল আশ্রয়ে পাড়ি জমান, এবং অন্যান্য সন্দেহভাজন, জনগোষ্ঠীও সীমান্তে আশ্রয় নেয়। ঐ স্বদেশ ত্যাগীদের প্রথম দল জনৈক চন্দন খাঁর নেতৃত্বে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মাতামুহুরী সীমান্তে এসে বসত গড়েন এবং ঐ বংশের শেষ সর্দার জালাল খাঁ, মোগলদের আনুগত্য গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি বিদ্রোহী হলে মোগলদের আক্রমণে সদলবলে স্থায়ীভাবে আরাকানে বিতাড়িত হোন। এদের সম্প্রদায়গত পরিচয় পরিষ্কার নয়, এবং অবস্থান কালটিও তেরো বছরে সীমাবদ্ধ। এই ঘটনার কয়েক বছর পর আরেক আরাকানী উপাজাতীয় সর্দার শের মস্ত খাঁ কিছু চাকমা অনুসারীসহ ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের মোগলশাসক জুল কদর খানের বশ্যতা স্বীকার ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তাতে তাকে কোদালা উপত্যকায় কিছু খাস পাহাড়ী জমি বন্দোবস্তি দেয়া হয় এবং তিনি পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পান। সঙ্গীয় চাকমারা শের মস্ত খাঁর খামারচাষী রূপে পুনর্বাসিত হয়। এটি হলো এতদাঞ্চলে সর্বপ্রথম চাকমা বসতি স্থাপনের ঘটনা। চাকমা রাণী কালিন্দি বিবির লিখিত স্বীকৃতি ও একটি চাকমা লোকগীতি অনুযায়ী বর্ণিত শের মস্ত খাঁই এতদাঞ্চলীয় আদি চাকমা রাজা, এবং এই সুত্রে তাঁর সঙ্গীয় স্বল্পসংখ্যাক অনুসারীরাই এদেশীয় আদি চাকমা সম্প্রদায়, যারা প্রকৃতই অভিবাসী।

এই প্রথম চাকমা অভিবাসন সত্বেও, তাদের বৃহদাংশ, এবং মূল আনুষ্ঠানিক সর্দার গোষ্ঠীকে, পরবর্তীকালেও, আরাকানে বসবাস করতে দেখা যায়। তাদের অন্যতম সর্দার শের জব্বার খাঁর সীলমোহরটি প্রমাণ করে, তার মেয়াদকাল ১৭৪৯-৬৫ আমলে, তিনি নিজেও চাকমা জনগোষ্ঠী আরাকানের রোসাং অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আরবী ভাষা বর্ণ ও ইসলামী বাক্য সম্বলিত ঐ সীলমোহর এবং মুসলিম নাম ও খেতাব হলো ঐ সর্দার বংশের পরিষ্কার মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারক। এই ঐতিহ্যের ধারা একাদিক্রমে দশজন রাজা রাণী পর্যন্ত বিস্তৃত, যাদের কার্যকাল হলো ১৭৩৭ থেকে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত ৯৫ বছর কাল দীর্ঘ। এই সময়ের এক তৃতীয়াংশ মাত্র মোগল আমলে পড়ে, এবং ঐ মোগল আমলটারও অধিকাংশ তাদের আরাকানবাসভুক্ত। বাকি দুই তৃতীয়াংশ হলো বৃটিশ আমল। সুতরাং মুসলিম বা মোগল প্রভাবে তাদের ইসলামী ঐতিহ্য চর্চার সুত্রপাত হয়েছে, এ দাবীটি গ্রহণ যোগ্য নয়।

১৭৮৭ সালে লিখিত আরাকানী রাজার চিঠিতে প্রমাণিত হয়, মগ, চাকমা, লুসাই, মুরুং ইত্যাদি জনগোষ্ঠী স্বদেশভূমি আরাকান ত্যাগ করে, এ দেশের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীত যে, সে দেশে তখনো ঐ লোকজনের

বসবাস ছিলো এবং ঐ উৎস থেকেই এতদাঞ্চলে স্থানান্তর গ্রহণের ফলে, এ দেশে ঐ লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। এ দেশ তাদের জাতিগত জন্মস্থান বা আবাসভূমি নয়। চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস। চাকমা লোককাহিনী রাধামোহন ধনপতির পালা ও চাটিগাং ছাড়া পালাটিও বিবৃত করেঃ এককালে চাকমারা কোন এক চম্পক নগরের অধিবাসী ছিলো। প্রধান রাজপুত্র বিজয়গিরি, সেনাপতি রাধা মোহন সহ সসৈন্যে দিগ্বিজয়ে বাহির হোন। তাঁরা মেঘনা দরিয়া, ত্রিপুরা ও চাটিগাং পাড়ি দিয়ে আরাকানের মগ রাজ্য দখল করেন। এই যুদ্ধে বার বছর অতিবাহিত হয়। পরে তারা স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে, পথিমধ্যে শুনতে পান যে, বৃদ্ধ রাজা সমরগিরি মারা গেছেন, এবং ছোট রাজকুমার উদয়গিরি রাজ্য ও সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন। তাতে বিজয়গিরি হতাশ হোন ও বিজিত রাজ্যে ফিরে যান। তিনি ও তার সৈন্যরা স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। তিনি নিঃসন্তান মারা গেলে পরে জনৈক সৈনিককে রাজা নির্বাচন করা হয়। এই বংশের রাজা মৈসাং ও অন্যান্যদের আমলে মগদের সাথে চাকমাদের বিরোধ বাঁধে। তখন তারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই কাহিনীটি ও সমর্থন করেঃ চাকমারা আদি বাংলাদেশী অধিবাসী নন। কথিত চাকমা রাজ্য অজ্ঞাত হলেও, মগ রাজ্য আরাকান ও বার্মা চিহ্নিত এলাকা। বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত ঐ মগ রাজ্যই ছিলো তাদের স্বদেশ।

আরাকানবাসী মিশ্র জনতার বাংলামুখী বৃহৎ বাস্তু ত্যাগ শুরু হয় ১৭৮৪ খ্রীঃ সালে আভা রাজ্যের আরাকান দখল ও আক্রমণের ফলে। তাতে লক্ষাধিক আরাকানীর আগমনে দক্ষিণ-পূর্ব চট্টগ্রাম অঞ্চল ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তখন মুসলিম বাঙ্গালী জনতা ও তাদের বংশধর জেরবাদীরা, স্থানীয় বাঙ্গালী জনসাধারণের মাঝে অবাধে আত্মস্থ হয়ে যায়। তবে অবাঙ্গালী অমুসলিমরা থেকে যায় আশ্রিত হয়ে। ১৭৯৯ সালে এই আশ্রিতজনদের দেখা-শোনা, নিয়ন্ত্রণ ও খাওয়া-পরার দায়িত্বে বৃটিশ সরকার মিঃ সিরিল কক্সকে নিযুক্ত করেন। তার স্থাপিত কেম্প এলাকাই বর্তমান শহর কক্সাবাজার। সাথে সাথে সরকার আরাকানী দখলদার কর্তৃপক্ষের সাথে, এই শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন নিয়ে দেনদরবার শুরু করেন। ইতোমধ্যে দেশ উদ্ধারের আরাকানী অভিযান ও শুরু হয়ে যায়। বর্মী দখলদার কর্তৃপক্ষ ভাবতে শুরু করেন ঃ কাজটি বৃটিশদের প্ররোচনাজাত ও মদদপুষ্ট। সুতরাং সমঝোতার পরিবর্তে তিক্ততাই বাড়তে থাকে, এবং এই তিক্ততা ১৮২৪ খ্রীঃ সালে এসে চরম আকার ধারণ করে, প্রথম বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধের রূপ নেয়, যার পরিণতি হলো ঃ বৃটিশ শক্তি কর্তৃক আরাকান দখল ও তাকে ভারতের অন্যতম প্রদেশ হিসাবে সংযোজন। প্রবাসের এই দীর্ঘ অন্তরবর্তী সময়কালে আরাকানী উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ লোক জুম চাষে প্রবৃত্ত হয়। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী বন ও পাহাড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ে, আর কিছু লোক পটুয়াখালী অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, এবং হয়ে পড়ে এদেশের আশ্রিত অভিবাসী বাসিন্দা।

ইতোমধ্যে আরেকদল আরাকানী এতদাঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে, যারা মোগলদের বিতাড়ন ও দখল সম্প্রসারণহেতু, এতদাঞ্চল থেকে প্রত্যাহৃত হতে বাধ্য হয়েছিলো। ওদেরই নেতা হয়ে ১৭৭৪ খ্রীঃ সালে ফিরে আসেন শেষ আরাকানী পরাজিত শাসক কংহ্লা প্রু, যাকে বোমাং রাজবংশের এদেশীয় আদিপুরুষ বলা হয়। আসলে তারা রাজা নন, গোত্রীয় সর্দার। দ্বিতীয় মগ জনগোষ্ঠী ও তাদের নিজস্ব সর্দার মাং বংশীয়দের আগমন কাল হলো ঃ ১৭৮৪ খ্রীঃ সালের পরবর্তী আভায়ী বিতাড়ণ আমল। এই গোত্রীয় লোকদের দলপতি হলেন জনৈক ম্রা-চাই। এই গোত্রের লোকেরা পেলেইং ছা এবং কংহ্লা প্রু নিয়ন্ত্রিত গোত্রের লোকেরা রিগ্রিছা নামে অভিহিত হোন।

আরেক লোক-বন্যার বাংলাদেশমুখী প্রবাহ শুরু হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে, আরাকান পর্যন্ত গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, জাপানের হাতে পতনের ফলে। অরাজকতা তাড়িত ও যুদ্ধাক্রান্ত জনতা বাংলা ভারতের দিকে ঢলের মত ছুটে। তাদের অনেকে স্বজন-পরিজনদের সমর্থন ও আশ্রয়ে আত্মস্থ্ হয়ে যায়। চট্টগ্রামী ও উপজাতীয় মূলের লোকেরা এতদাঞ্চলেই ঘর বাধে। উপদ্রুত হওয়ার কারণে প্রশাসন ও জনসাধারণের সহানুভূতি ছিলো তাদের পক্ষে।

অপর জনস্রোতের উদ্ভব হয় ১৯৪৭সালের দেশবিভাগ কালে। তখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা হাঙ্গামায় উপদ্রুত হয়ে, হিন্দুদের ঢল ছুটে ভারতের দিকে, এবং ভারতীয় মুসলমানরা বন্যার মত ছুটে আসেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মুখে। চট্টগ্রামেও তাদের ভীড় জমে। ঐ শরণার্থীদের একাংশ ছুটে আসে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে, যাদেরকে মানবিক কারণে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসিত করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকসংখ্যার সর্বশেষ ও বৃহৎ সংযোজন হলো ১৯৭৮ পরবর্তী বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ব্যবস্থায় যা সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যায় প্রায় ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করে, বাঙ্গালী ও উপজাতিদের প্রায় সমান শক্তিতে উন্নীত করেছে।

দলিলপত্র সুত্রে প্রমাণিত হয় যে, মুলত আরাকানী শরণার্থী দলের সঙ্গী হয়ে চাকমাদের অধিকাংশ এতদাঞ্চলে এসেছে এবং বাংলাভাষী হওয়ার গুণে ও শের মস্ত খাঁর অনুসারী পূর্ব প্রবাসী চাকমা স্বজনদের সৌজন্যে আর সমর্থনে ও বটে, ধীরে ধীরে স্থানীয়দের মাঝে আত্মস্থ্ হয়ে গেছে। এভাবে এ দেশের চাকমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ধীরে ধীরে ও বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয়েছে, যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাদের লোকস্মৃতি, লোকগীতি ও রাজ পরিবারের ইতিহাসে। এই ঘটনাবলী প্রমাণ করে, তারা স্থানীয় আদিবাসী জনসমষ্টি নয়, ঘটনাচক্রে উপদ্রুত বিদেশাগত লোকও শরণার্থী রূপে মানবিক কারণে এ দেশে আশ্রিত। মগ ও অন্যান্য অধিবাসীদের আগমন ও বসবাস ইতিহাসে স্বীকৃত। তবে চাকমা অধিবাস কিছুটা প্রশ্ন বোধক। সঠিক না হলেও তারা স্থানীয় ভাবে আদিবাসিন্দা ও আদিবাসী হওয়ার দাবীতে সোচ্চার, এবং নিজেদের বহিরাগত মানতে নারাজ।

ত্রিপুরা মিজোরাম ও আরাকান ত্যাগী উপজাতিদের, এতদাঞ্চলে, আগমন ও অভিবাসন গ্রহণ ছাড়া ও ১৮৬০-৯২ আমল পর্যন্ত পরিচালিত কুকি ও অন্যান্য উপ-জাতীয়দের বিরুদ্ধে পরিচালিত লুসাই অভিযান কালে, সংগৃহীত হয় অনেক নেপালী, ভুট্টানী ও আসামী সিপাহী শন্ত্রী, এবং সড়ক ও চলাচল পথ নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করা হয় কিছু উত্তর বঙ্গীয় সাওতালকে, যারা অবসরকালে এতদাঞ্চলেই পুনর্বাসন গ্রহণ করে নেয়।

চাকমা প্রধানেরা প্রথমতঃ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার অভিবাসী ছিলেন। সাধারণ চাকমারা ছিলো পাহাড়বাসী বনচারী জুমিয়া। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রতিবেশী বাঙ্গালী অধিবাসীরাই ছিলো রাজবাড়ী পরিবেষ্টিত আপনজন। ১৮৭৩ সালে ইংরেজ কর্তৃক চাকমা রাজ দপ্তর রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরে রাজা হরিশ চন্দ্র বাধ্য হওয়ায়, রাজ আনুকূল্য ও উৎসাহে অনেক প্রতিবেশী বাঙ্গালী পরিবার রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে, সরকারী সদর দপ্তরের অদূরে বালুখালিতে পুনর্বাসিত হোন। তাদের অনেককে মাতবর তালুকদার পদবি ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরের রাজবাড়ীর বাঙ্গালী পরিবেশ, নব প্রতিষ্ঠিত বালুখালির রাজবাড়ীতেও রচিত হয়। গড়ে ওঠে বাঙ্গালী বেষ্টনী ও প্ররিবেশ। ওটা আখ্যায়িত হয় বাঙ্গালী পুরান বস্তি নামে। চাকমারা এখানেও রাজবাড়ীর প্রতিবেশী ছিলো না। তারা ছিলো অতি সাধারণ নিম্নমান সম্পন্ন প্রজা। রাজাকে কুর্ণিশ করা, নজর নিয়াজ দেয়া, প্রথম ফসলের অংশ দান, শিকারের ভাগ দান, বিয়া-শাদিতে চাঁদা দান, বিচার-আচারে ফি ও জরিমানা দান, অলংকার ও পাকা বাড়ী-ঘর তৈরিতে সালামী দান, ও উচ্চ শিক্ষা লাভে নজরানা দান ইত্যাদি ছিলো ঐ চাকমা প্রজাদের মান্য কর্মক্রিয়া। জুতা পায়ে ও ছাতা মাথায় রাজবাড়ী অতিক্রম করা ছিলো তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বাঙ্গালীরাই ছিলো তাদের ঐ রাজকীয়তা পালন ও রক্ষার প্রহরী। হেডম্যানরা প্রজাদের এসব রীতিনীতির প্রশিক্ষণ মহড়া দিতেন। তারাও নিতেন রাজ প্রতিনিধির প্রাপ্য সম্মান।

লুসাই অভিযান কালে কুকিডর খ্যাত কুকি আক্রমণের ভয়ে, চাকমাদের অনেকে ফেনী উপত্যকায় পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। ফলে রাণী কালিন্দির প্রতিনিধি কুমার হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক, বাহক ও পথ প্রদর্শক সংগ্রহ করে, অভিযানে সহযোগিতা করেন। ঐ বাঙ্গালীদের অনেককে তাদের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ, এতদাঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। রাজা ও হেডম্যানদের প্রাপ্ত নিষ্কর জমি-জমার চাষাবাদ, জুমিয়াদের হাল চাষ ও জমি আবাদকরণ পদ্ধতি শিক্ষাদান বাড়ি ঘর নির্মাণ ইত্যাদি কাজে মজোরি ও মাসোহারার বিনিময়ে, অনেক বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয়। ব্যবসা সুত্রে ঘর বাড়ি নির্মাণে কৃষি কাজে অনেক বাঙ্গালী দোকানদার, কৃষক ঠিকাদার, মহালদার, বেপারী ও পেশাদার লোক, এতদাঞ্চলে স্থায়ী ও অস্থায়ী আস্তানা পাতেন এবং তাদের বংশধরেরা জমি বাড়ী ও ব্যবসার মালিক হোন। তবু এতদাঞ্চল ছিলো বাঙ্গালী সমাজমুক্ত বন্য দুর্গম, ম্যালেরিয়া ও হিংস্র জন্তুজানোয়ার কবলিত, আর বিপরীতে নিম্নাঞ্চলের সমতল বসবাসের পক্ষে পর্যাপ্ত ও স্বচ্ছন্দ। তাই পাহাড়ভ্যন্তরে বাঙ্গালী বসতি বিস্তার ছিলো আকর্ষণহীণ। পক্ষান্তরে জুম চাষের সুবিধা ও বন্দোবস্তিহীন জমি প্রাপ্তি নিশ্চিত থাকায়, দেশী-বিদেশী জুমজীবীরা বিপুল সংখ্যায় এখানে ভীড় জমায়। বাঙ্গারীদের উপর জারি

হয়, পার্বত্য আইনের ৫২ ধারার আওতায় প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে ঘন পাহাড়ীলোক অধ্যুষিত বাঙালী বিরল ব্যতিক্রমী আরেক এলাকা। এরই পরিণতিহলো উপজাতীদের রাজনৈতিক উচ্ছাভিলাশ ও বিদ্রোহ। এরই অস্বাভাবিকতা ভাংতে প্রয়োজন হয়েছে ১৯৭৮ পরবর্তী বাঙালি বসতি স্থাপন ব্যবস্থার, যার বিরোধীতায় উপজাতিরা সোচ্চার। এই শেষ জনস্রোত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও অখন্ডতা রক্ষার পক্ষে পরিচালিত এক বিপ্লব। উপজাতি বাঙালীদের সংখ্যা সাম্য রচনাই এর লক্ষ্য। তা না হলে সংখ্যা প্রাধান্যের বলে এতদাঞ্চলের স্বাধীনতা, উপজাতিদের কাম্য হবে। যে প্রবণতা তাদের একাধিক সশস্ত্র বিদ্রোহকে সংগঠিত করেছে। জাতিগত প্রাধান্যের বলে অর্জিত পাক-ভারত-বাংলার জন্ম রহস্যই, স্থানীয় স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহজনক উদাহরণ।

৩। চাকমা ইতিহাস ও তার তথ্য ভিত্তি।

প্রচলিত চাকমা ইতিহাস প্রধানত ঃ কিছু লোকগীতি ও কিংবদন্তিকে অবলম্বন করে রচিত। বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিগ্রাহ্য, সমসাময়িক ইতিহাসের দ্বারা তা সমর্থিত, বা প্রামাণ্য তথ্যে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ নয়। তবু যুক্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে অনেক কাহিনী ইতিহাসের মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যুক্তিগত বিচারে চাকমা ইতিহাসের অনেক বর্ণনাই অতিরঞ্জিত বা কল্পকাহিনীর সমষ্টি। বর্তমানে উদঘাটিত প্রামাণ্য দলিল প্রমাণগুলো, ইতিহাসের নামে প্রচলিত, চাকমা পুরা কাহিনীর অনেক কিছুই নাকচ করে দেয়। সাথে সাথে সে পুরাকাহিনীর অনেক কিছুই ইতিহাসের স্বীকৃতি লাভের যোগ্য বলে ও মনে হয়। যুক্তি ও বাস্তবতার বিচারে কিছু কাহিনীকে অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট বলার উপায় নেই। কিছু কাহিনী প্রামাণ্য না হলেও যুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। চাকমা পন্ডিতেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ সূত্রগুলোর সংগ্রহ আর পরিবেশনে এ যাবত অমনোযোগী আছেন। তাদের পরিবেশিক কাহিনীগুলোর অতি রঞ্জিত অংশগুলো যাচাই বাছাই করা জরুরী। এটাও সত্য যে তথ্য সুত্রগুলোর অধিকাংশ, তাদের দ্বারাই সংগৃহীত ও পরিবেশিত। তবে তা কমই ব্যবহৃত হয়েছে। নতুবা আজ তাদের রচনাগুলোকে আজগুবী রূপকাহিনী ভাবার সুযোগ হতো না।

চাকমা লোকগীতি ‘রাধা মোহন ধনপতিস্ব ও ‘চাটিগাং ছাড়া’ পালা ‘উবা গীতি’ ও ‘বিজগ’ ইত্যাদি মূলতঃ পুরাকাহিনীর সমষ্টি। সেগুলোতে তাদের আদি বাসস্থান, দেশান্তর, দিগ্বিজয়, যুদ্ধাভিযান, বীরত্ব, জয়, পরাজয়, প্রেম বিরহ, আবেগ, আকাঙ্খা, রাজ্য, রাজত্ব, রাজকাহিনী ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ সেগুলো পৃথক পৃথক নামে একই মহাকাব্যের অংশ। ওগুলো মৌখিক কাব্যসাহিত্য ও বটে, যার ধারক ও গায়ক হলেন, অতি সাধারন লোক শিল্পী, যারা সমাজে ‘গেংকুলি’ গায়ক নামে খ্যাত।

গানগুলোর রচনাকাল ও রচয়িতা অজ্ঞাত। তবে শিষ্য পরম্পরায় সুদূর অতীত থেকে মৌখিক চর্চার মাধ্যমে ওগুলো বেঁচে আছে। ওগুলো চাকমা ইতিহাসের মৌলিক উৎস। কেউ কেউ তার সাথে কিছু যোগ বিয়োগ করে, কিছু বাড়তি বর্ননা ও নতুনত্ব দানের চেষ্টা করেছেন ও করছেন। প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায়ের রচনা 'চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাস ক্ত ও বিরাজ মোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' আর অধুনা বাবু সুগত চাকমার লিখিত চাকমা পরিচিতি ইত্যাদি সে প্রয়াসেরই অংশ। মনে হয় গেংকুলি শব্দটি জ্ঞান কলিরই অপভ্রংশ।

বর্ণিত চাকমা ইতিহাসের ঘটনাগুলোর অনেকটাই বিপরীত সুত্র, আর পারস্পরিক বর্ণনার ভিন্নতার দ্বারা বিতর্কিত। রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত রাজতালিকা, আর বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান ও অন্যান্যের উল্লেখিত রাজতালিকা এক নয়। রাণী কালিন্দির বর্ণনার বিচারে সম্পুর্ণ রাজতালিকাই অতিরঞ্জিত। লোক কাহিনীতে ব্যক্ত দিগ্বিজয়ী রাজা বিজয় গিরির ভ্রাতৃ ও পিতৃ পরিচয় এবং সেনাপতি রাধা মোহনের সম্পর্ক বর্ণনায়, উপরোক্ত গ্রন্থকারদের পরস্পরের মাঝে বিস্তর অমিল বিদ্যমান। বাবু সুগত চাকমা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ঃ ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড থেকে, লুসাই পর্যন্ত বিস্তৃত, চট্টগ্রামও পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে একদা একটি স্বাধীন চাকমা রাজ্যের অস্তিত্ব ছিলো। অথচ দলিল প্রমাণ ও সমসাময়িক ইতিহাসের মূল্যায়নে তা এক উদ্ভট দাবী। (সূত্র চাকমা পরিচিতি)

এ যাবৎ প্রাপ্ত চাকমা ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেক বিস্ময়কর তথ্যই লাভ করা যায়। সংখ্যায় কম হলেও সে উপাদানগুলো গুরুত্বপুর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। প্রাপ্ত উপাদানগুলো ছাড়াও এখনো উদ্ধার যোগ্য, বহু অতিরিক্ত তথ্য সুত্রের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্ভব, যেগুলো সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নয়। চাকমা রাজ সেরেস্তায় পুরাতন আমলের চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, অলংকার, উপকরণ ইত্যাদি না থাকার কথা নয়। রাজ পরিবার তাদের আত্মীয় কুটুম ও চাকমা পন্ডিতমহল সচেষ্ট হলে সে সব সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। কর্ণফুলী ও তার উপনদী সমূহের উপত্যকা অঞ্চল বাদে ও চাকমাদের প্রাচীন বস্তি অঞ্চলসমূহে হয়তো এখনো অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে এবং সংখ্যায় অল্প হলেও সেসব জায়গায় এখনো অনেক চাকমা অধিবাসী টিকে আছেন, যাদের মাধ্যমে ঐসব জায়গার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক নির্দশনগুলো এখনো পাওয়া সম্ভব। রামু তৈনছড়ি ও আলী কদম, চাকমাদের পরিত্যক্ত প্রাচীন বসতি অঞ্চল। সে সব জায়গায় অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনো দৃশ্যমান। প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধানীদের সে সব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে ফেরার সম্ভাবনা কম। আমার বৃদ্ধাবস্থা, দুর্বল আর্থিক সঙ্গতি, নিরাপত্তাজনিত ভীতি, আর শিক্ষাগত দীনতাই, সে দুরূহ কাজ সমাধান থেকে আমাকে বিরত রেখেছে। তবু ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি রূপী পুস্তক কটি আমার বিপুল পরিশ্রম, আর্থিক ক্ষতি, কষ্ট ও ব্যয় স্বীকারের ফল।

প্রাচীন চাকমা বসতিসমূহের কোথাও ধর্মীয় স্থাপনা সমূহের ধ্বংসাবশেষ এবং অতীত বিবরণ ভিত্তিক প্রত্ন নিদর্শন বা দলিল আবিষ্কৃত হয়নি, নইলে তাদের প্রাচীন ধর্মীয় পরিচয় সন্দেহমুক্ত হতো। ঠিক একই কারণে সামাজিক পরিচয়ের ধারাবাহিকতাও নিশ্চিত হতো।

এখানে হালে সংগৃহীত কিছু ঐতিহাসিক উপাদানের তালিকা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন আবশ্যক, যেগুলো এতদাঞ্চলীয় ইতিহাসের নতুন তথ্যভিত্তি, যথা ঃ

ক) চাকমা রাজ পুরুষদের ব্যবহৃত কিছু প্রাচীন সিলমোহর।

খ) চাকমা রাজকীয় পুরার্কীতি ও স্থাপত্য নিদর্শন।

গ) চাকমা অভিজাতদের ব্যবহৃত প্রাচীন সাজপোশাকও অলংকার।

ঘ) কিছু প্রাচীন পুঁথি, পুস্তক, রচনা, দলিল ও আধুনিক গবেষণাপত্র।

ঙ) চাকমা লোককাহিনী ও লোকগীতি।

চ) চাকমা ভাষা, সংস্কার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য।

৪। চাকমা রাজাদের ব্যবহৃত সীলমোহর।

এ পর্যন্ত পন্ডিতমহল, চাকমা রাজ পরিবারের সংগ্রহ থেকে দশটি রাজকীয় সীলমোহরের ছাপ চিত্র গ্রহণ করেছেন। আমার সংগ্রহে একটি বাদে নয়টি চিত্র আছে। না পাওয়া সীলমোহরটি জনৈক নূরুল্লাহ খান নামীয় রাজার। সীলমোহরগুলো যথার্থ পাঠোদ্ধারের কিছু চেষ্টা এ যাবৎ হয়েছে, তবে তা বিভ্রান্তিমুক্ত নয়। দেখা যায়, এগুলোর আটটি, আরবী বর্ণ সম্বলিত। দু'টিতে বাংলা ভাষ্য আরবী বর্ণে লিখিত ও হিন্দুদেব দেবীর কীর্তন অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে ক্রমান্বয়ে সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পরিচয় ব্যক্ত হলো।

১) প্রাচীনত্বের বিচারে প্রাপ্ত প্রথম সীলমোহরটি জনৈকা 'সোনাবি' নামীয় মহিলার। তাতে নামের শেষে 'এগারশ দুই' অংকের উল্লেখ আছে। লেখ শৈলীর বিচারে তা অপটু হাতে প্রস্তুত। তাই তাতে অঙ্কিত বর্ণগুলো অপরিপক্ক। এটা আয়তনে ও আকারে চতুস্কোণ। দ্রষ্টব্য ছাপ চিত্র প্রথম খণ্ড।

২) দ্বিতীয় সীলমোহরটি জনৈক শের জব্বার খানের। একটি বৃত্তের ভিতর প্রথমে এক লাইনে 'রোসান আরাকান' দ্বিতীয় লাইনে' আল্লাহু রাব্বি ক্ত বাক্য এবং শেষ লাইনে 'শের জব্বার খান' লিখিত এবং নামের উপরে ১১১১ সংখ্যার উল্লেখ আছে। লেখশৈলীর বিচারে এটাও অপটু হাতে তৈরী, হিজিবিজি অপরিস্কার। আয়তনে ও আকারে এটি ডিম্বাকার রেখায় আবদ্ধ। প্রথম ছাপ চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

৩) তৃতীয় সীলমোহরটি জনৈক নূরুল্লাহ খানের। ওটির ছাপ চিত্র আমার কাছে নেই। তাই তার আকৃতি ও লেখ শৈলীর আসল ছাপ প্রদর্শন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। সীলমোহরটির কোন ছাপচিত্র কোথাও প্রদর্শিত না হওয়ায়, তার পাঠোদ্ধার, বিশ্লেষণ দান বা এখানে তা প্রদর্শন আমার দ্বারা সম্ভব হলো না। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটির গবেষণা পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ জুন ১৯৮২ তে 'চাকমা জাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক' নামীয় প্রবন্ধে বাবু অশোক দেওয়ান সীলমোহরটির ভাষ্য এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ 'নূরুল্লাহখান পিসরে শের জব্বার খান জমিদার সন ১১২৭'। এই বর্ণনার ভিত্তিতে প্রথম খণ্ডে ব্যক্ত চিত্রটি আমি এঁকেছি।

৪) চতুর্থ সীলমোহরটি, ফতেহ খাঁ নামীয় জনৈক ব্যক্তির। ডিম্বাকার ঐ সীলমোহরটির লেখাগুলো পরিষ্কার এবং তাতে ১১৩৩ সংখ্যাটি উল্লেখিত আছে। প্রথম খণ্ডে তার ছাপ চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

৫) পঞ্চম সীলমোহরটি 'জান বখশ খান মহারাজ' বর্ণনা সম্বলিত। লেখ শৈলীর বিচারে তা স্পষ্ট ও সর্বাধিক সুন্দর। ক্ষেত্র হিসেবেও তা হরতনের মত, যার উপরের অংশ ভিতরের দিকে চাপা। ১১৪৫ সংখ্যাটি তাতে স্পষ্টভাবে অংকিত আছে। প্রথম খণ্ডে ছাপ চিত্রটি-দ্রষ্টব্য।

৬) ষষ্ঠ সীলমোহরটি জনৈক জব্বার খান নামীয় ব্যক্তির। তার উপরে নীচে আরবী বর্ণ অংকিত ক্রমিক বক্তব্য হলো ঃ 'শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ তারা, জব্বার খান ১১৬৩।' এটা গঠনে ডিম্বাকার। ছাপ চিত্রটি-দ্রষ্টব্য।

৭) সপ্তম সীলমোহরটি ধরম বখশ খান নামীয় ব্যক্তির, যার ভিতরকার আরবী বর্ণে বক্তব্য হলো ঃ জয় কালি সহায় ধরম বখশ খান। তাও ডিম্বাকার তবে সংখ্যাহীন। প্রথম খণ্ডে ছাপ চিত্রটি-দ্রষ্টব্য।

৮) অষ্টম সীলমোহরটির আরবী লেখ শৈলী সুন্দর, আকৃতি ডিম্বাকার ও তাতে ১১১৫ সংখ্যার উল্লেখ আছে। তৃতীয় কনিষ্ঠ এই সীলমোহরটি শুকদেব রায় বাহাদুরের। সীল মোহরীয় চিত্রটি দ্রষ্টব্যঃ

৯) নবম সীলমোহরটি রেখাচিত্র সমৃদ্ধ। তাতে বর্ণে ও সংখ্যায় লিখিত কোন ভাষ্য নেই। জোড়া গোল রেখার বেষ্টনীতে আবদ্ধ, চিত্রলিপি আখ্যা যোগ্য এই রেখাচিত্রটিকে কেউ কেউ সিংহ চিত্র বলে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজকীয় প্রতীক বলে কথিত হয়। চিত্রটি প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১০) দশম সীল মোহরটি জনৈক শের দৌলত খাঁর যেটি আরবী বর্ণে লেখা তাতে সংখ্যা আছে ১১৩৫।

এখন এই পরিচয়ের ভিত্তিতে বর্ণিত সীলমোহরগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন এবং

সেগুলোতে উল্লেখিত সংখ্যাগুলোর রহস্যোদঘাটন আবশ্যক। সীলমোহরগুলোর দ্বারা নিম্নোক্ত তথ্যাদি লাভ করা সম্ভব, যথা ঃ

ক) চাকমা সম্প্রদায় ও তাদের প্রধানদের মূল বাসস্থান ও বাংলাদেশে বসবাসের কাল।

খ) সীলমোহরে উল্লেখিত সংখ্যাগুলোর পঞ্জিকা ও সংশ্লিষ্ট রাজাদের কার্যকাল।

গ) চাকমা রাজাদের মুসলিশ নাম খেতাব ও আরবী বর্ণ ব্যবহারের রহস্য।

মোট নয়টি সীলমোহরের আটটিতে, যে সংখ্যাগুলোর উল্লেখ আছে, মঘী সন হওয়ার ভিত্তিতে, ক্রমানুসারে সেগুলোর ধারক ব্যক্তিগণের সবাই নিজ নিজ পরিচয় ও ব্যক্তি চরিত্রকে স্ব-স্ব সীলমোহরে বক্তব্যাদিন মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাদের কার্যকাল আর মর্যাদা ও তাতে বিবৃত হয়েছে। দেখা যায়, সোনা বি নামীয় জনৈকা মহিলার সীলমোহরটি সর্বাধিক পুরাতন। সীলমোহরগুলো ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতীক এ হিসেবে সোনা বির পূর্ববর্তী কথিত চাকমা প্রধানদের স্বীকৃতি, প্রামাণ্য বা আনুষ্ঠানিক নয়। তবে এর দ্বারা পূর্ব বংশ ধারা অস্বীকৃত হয় না। রাজ পরিবার সুত্রে দাবিকৃত দীর্ঘ বংশ ধারার বিপরীতে প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর দ্বারা রাজাদের প্রকৃত সংখ্যা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। প্রাপ্ত সীলমোহরগুলোর দ্বারা স্থির যোগ্য রাজ তালিকাকে চূড়ান্ত ভাবাও যায় না। আরো অনাবিষ্কৃত নিদর্শন উদ্ধারের দ্বারা ভবিষ্যতে সে তালিকাটি আরো দীর্ঘ হতেও পারে। বাংলাদেশ বহির্ভুত অঞ্চলে তাদের পরিত্যক্ত বসবাস নিয়ে প্রামাণ্য তথ্য উদঘাটিত হলে, এই ইতিহাসে আরো সংযোজন ঘটাও সম্ভব। এখানে সীলমোহরগুলোর দ্বারা প্রমাণিত রাজ মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিতরই, আপাততঃ ঐতিহাসিক আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। অবশিষ্ট কথা কাহিনীগুলোতে কিংবদন্তিভুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই। সীল মোহর গুলোতে আরবী বর্ণ, মুসলিম নাম ও খেতাবের ব্যবহার, ইসলামী ও হিন্দুধর্মীয় বাক্য প্রয়োগ এবং তার ধারকদের বসবাস ক্ষেত্রের বর্ণনা, এ বিষয়গুলোই, এখানে প্রধান আলোচ্য। সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলোর রহস্য উদঘাটিত হলে সেসবের প্রয়োগকাল সম্বন্ধীয় ধাঁধাটিও কেটে যাবে। তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে চাকমা ইতিহাস রহস্যাবৃত কিছু নয়।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই বর্ণিত সংখ্যাগুলোর রহস্য উদঘাটন দরকার। সংখ্যাগুলোর সম্ভাব্য পঞ্জিকা নির্ণয়ের সুবিধার্থে এখানে কিছু আলোচনা অপরিহার্য।

অতীতে চট্টগ্রাম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরাকানী শাসন ও মঘী সনের প্রচলন থাকার কথা প্রাচীন পুঁথি পুস্তক ও দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত। সে হিসাবে চাকমা রাজকীয় সীলমোহরগুলোতে মঘী সন ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলিম শাহী ও নবাবী দপ্তরে হিজরী সনের প্রচলন ছিলো। হিন্দু সমাজ বাংলা সনের প্রতি হামেশাই অধিক অনুরক্ত। তবে আরাকানী দখল ও শাসন হেতু এতদাঞ্চলে মঘীর প্রচলন

ছিলো, যার প্রত্যক্ষ চর্চাক্ষেত্র হলো ব্রহ্মদেশ ও আরাকান। হিন্দুস্তানে ১৫৫৬ খ্রীঃ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে বাদশাহ আকবরের সিংহাসনে আরোহনের দিনকে ভিত্তি ধরে, হিজরী চান্দ্র সনকে সৌর সনে পরিবর্তিত করে, ফসলী সন নামে এক নতুন পঞ্জিকার প্রবর্তন করা হয়, যা পরিশেষে বাংলা অঞ্চলে বাংলা সন নামে অভিহিত হয়। সৌর বছরের মোটামুটি ১১.৮৬ দিন আগে চান্দ্র বছর শেষ হয়ে যায়, তাই চান্দ্র বছর পৌর বছরের মত ৩৬৫.২৫ দিনে হয় না। খ্রীঃ সনের চেয়ে শকাব্দ ৭৮ বছর, বাংলা ৫৯৩ বছর ও মঘী ৬৩৮ বছরের ছোট। এই হিসাবের ভিত্তিতে সন্দেহ মোচনার্থে সীলমোহরগুলোতে ব্যক্ত সংখ্যাগুলোর পৃথক পঞ্জিকাভিত্তিক কাল উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তাতে ঐ সংখ্যাগুলোর পঞ্জিকা বিভ্রান্তির জবাব পাওয়া সম্ভব হবে। এখানে একটি ছক দ্রষ্টব্য, যেটিতে সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলোকে, প্রচলিত কয়েকটি পঞ্জিকার হিসাবে তার সম্ভাব্যকালে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে তুলনামূলকভাবে বর্ণিত সংখ্যাগুলোর সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সহজ হয়।

১-সোনা বি ১১০২ (তুলনীয় পঞ্জিকা ঃ মঘী, বাংলা, হিজরী)

ক) মঘী ১১০২ বাংলা ১১৪৭ হিজরী ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪০

খ) বাংলা ১১০২ মঘী ৯৫৭ হিজরী ১১০৬ খ্রীস্টাব্দ ১৬১৫

গ) হিজরী ১১০২ মঘী ১০৫৩ বাংলা ১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৬১৯

২. শের জব্বার খান ১১১১/

ক) মঘী ১১১১=বাংলা ১১৫৬ হিজরী ১১৬২ খ্রীস্টাব্দ ১৭৪৯

খ) বাংলা ১১১১=মঘী ১০৬৬ হিজরী ১১১৬ খ্রীস্টাব্দ ১৭০৪

গ) হিজরী ১১১১ মঘী ১০৬২ বাংলা ১১০৭ খ্রীস্টাব্দ ১৬৯৯

৩. নুরুল্লাহ খান ১১২৭/

ক) মঘী ১১২৭=বাংলা ১১৭২ হিজরী ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৫

খ) বাংলা ১১২৭=মঘী ১০৮২ হিজরী ১১৩২ খ্রীস্টাব্দ ১৭২০

গ) হিজরী ১১২৭=মঘী ১০৭৭ বাংলা ১২২২ খ্রীষ্টাব্দ ১৭১৫

৪. ফতেহ খান ১১৩৩/

ক) মঘী ১১৩৩ বাংলা ১১৭৮ হিজরী ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭১

খ) বাংলা ১১৩৩ মঘী ১০৮৮ হিজরী ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২৬

গ) হিজরী ১১৩৩ মঘী ১০৮৩ বাংলা ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২১

৫. জান বখশ খান ১১৪৫/

ক) মঘী ১১৪৫=বাংলা ১১৯০ হিজরী ১১৯৭ খ্রীস্টাব্দ ১৭৮৩

খ) বাংলা ১১৪৫=মঘী ১১০০ হিজরী ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৮

গ) হিজরী ১১৪৫=মঘী ১০৯৪ বাংলা ১১৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩২

৬. জব্বার খান ১১৬৩

ক) মঘী ১১৬৩=বাংলা ১২০৮ হিজরী ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ ১৮০১

খ) বাংলা ১১৬৩=মঘী ১১১৮ হিজরী ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৬

গ) হিজরী ১১৬৩=মঘী ১১১২ বাংলা ১১৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২০

৭. ধরম বখশ খান ঃ কোন সংখ্যার উল্লেখ নেই

৮. শুকদেব রায় ১১১৫

ক) মঘী ১১১৫=মঘী বাংলা ১১৬০ হিজরী ১১৭০ খ্রীস্টাব্দ ১৭৫৩

খ) বাংলা ১১১৫=মঘী ১০৭০ হিজরী ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৩

গ) হিজরী ১১১৫=মঘী ১০৫৭ বাংলা ১০০৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯০

৯. শের দৌলৎ খাঁন ১১৩৫

ক) মঘী ১১৩৫=বাংলা ১১৮০ হিজরী ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৩

খ) বাংলা ১১৩৫=মঘী ১০৯০ হিজরী ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২৮

গ) হিজরী ১১৩৫=মঘী ১০৮৪ বাংলা ১১২৯ খ্রীষ্টাব্দ ১৭২২

ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণামূলক নিবন্ধে, কয়েকজন চাকমা রাজার সময়কাল সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, বর্ণিত সীলমোহরীয় সংখ্যাগুলো মঘী হিসাবে তার সাথেও সামঞ্জস্যপুর্ণ। তবে বাস্তব হিসাবে হুবহু নয়, যথাঃ

১। শের মস্ত খান ১৭৩৭-১৭৫৮ খ্রীঃ মোতাবেক ১০৯৯-১১২০ মঘী

২। শের জব্বার খান ১৭৫৮-৬৫ খ্রীঃ মোতাবেক ১১২০-২৭ মঘী সীলমোহরীয় সন ১১১১ মঘী সমান ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ

৩। শের দৌলত খান ১৭৬৫-৮২ খ্রীঃ মোতাবেক ১১২৭-৪৪ মঘী সীলমোহরীয় সন ১১৩৫ মঘী সমান ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

(সুত্র ঃ রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ....ড. এ এম সিরাজুদ্দিন, জার্নাল অফ দি পাকিস্তান হিষ্টোরিকেল সোসাইটি করাচী, খন্ড : ১৯ ঃ ভাগ ১, জানুয়ারী ১৯৭১)।

আমার মতে, বাবু অশোক দেওয়ান কর্তৃক বর্ণিত নূরুল্লাহ খানের সীলমোহরীয় সংখ্যাটির পাঠ সঠিক নয়। শুকদেব রায় বাহাদুর নামের সীলমোহরটির সংখ্যাতে ও পঠনজাত ভুল আছে। শুকদেব রায় নামীয় সীলমোহরে বর্ণিত সংখ্যাটি ১২১৫ নয় ১১১৫ হবে।

এটা ধাঁধাঁর ব্যাপার যে, আদি রাজা শের মস্ত খাঁ বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম অধিবাস গ্রহণকারী চাকমা হলেও তাঁর বন্দোবস্তি বা ক্ষমতার স্মারক কোন দলিল বা প্রত্নবস্তু নেই। তার কথিত পুত্র বা পোষ্য পুত্র শুকদেবের স্মারক সীলমোহর, শুক বিলাস নামীয় একটি জায়গা, আর শ্রুতি কথা ছাড়া সে যুগের প্রামাণ্য অন্য কিছুই প্রাপ্তব্য নয়। পরবর্তীকালে রাণী কালিন্দির দেওয়াল লিপিতে আর চাকমা জনসাধারণ কর্তৃক চর্চিত লোকগীতিতে শের মস্ত খাঁর আদি রাজারূপে উল্লেখ থাকায়, অতীত কথাকাহিনীতে তার স্থান হয়েছে। অথচ তার সময় কালকে সীলমোহরের দ্বারা দখল করে আছেন অপর দুই চাকমা প্রধান যথা ঃ সোনা বি ও শের জব্বার খাঁন। অবশ্য প্রচলিত চাকমা ইতিহাসে এদের ও স্বীকৃতি নেই। রাজা নয়, জমিদার রূপেই শুকদেব স্বীকৃত, যা লোকগীতিতে ব্যক্ত হয়েছে।

নূরুল্লাহ খানের নামে প্রাপ্ত সীলমোহরটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং তার পাঠের পুরাপুরি শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে অশোক বাবুকৃত পাঠের কিছু অংশ শুদ্ধ ধরে সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। বাবু অশোখ দেওয়ানকৃত সনটি ১১১৭ মঘী হলে, তা ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ সালে পরিণত হয়। তখন রাজা শের মস্ত খাঁ অথবা শের জব্বার খাঁর সময়কাল। তদুপরি নুরুল্লাহ খাঁ শের মস্ত খাঁর প্রত্যক্ষ বংশধর বা উত্তরাধিকারী নন। কার্যত: দেখা যায়, তাঁর পিতা শের জব্বার খানই ভ্রাতৃ সম্পর্কের বলে ১৭৫৮ সালে নিঃসন্তান শের মস্ত খাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন। পিতাকে ডিঙ্গিয়ে, শের মস্ত খানের উত্তরাধিকারী হওয়া নুল্লা খাঁর পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। অথচ মূল্যবান প্রত্ন নির্দশন সীলমোহরটি তাঁর ক্ষমতার সমর্থক। তাতে লেখা 'নূরুল্লাহ খাঁন পিসরে শের জব্বার খান জমিদার' এই বাক্যটি সঠিত হলে, তাঁর সঠিক সময়কাল ১১১৭ মঘী সন বলে নিরূপিত হতে পারে না। সংখ্যাটির শেষাংশ ১৭ না হয়ে ২৭ হওয়াই সম্ভব। আরবী এক অংকের মাথায় সামান্য একটু বাঁক লাগালেই তা দুই হয়ে যায়। অপটু রেখা আর অপরিস্কার ছাপচিত্রের কারণেও বটে, আরবী পাঁচ, সাত, এক ও দুই সংখ্যায় গঠনগত ভিন্নতা ঘটা ও রূপ পরিচয়ে তফাৎ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। সুতরাং ১১১৭ এর

মূল সংখ্যা ১১২৭ ই হবে, যে সময়টিকে নুরুল্লাহ খানের ক্ষমতা লাভের সম্ভাব্য সময় কাল জ্ঞান করা যাবে। পিতা শের জব্বার খানের মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করাও স্বাভাবিক। তৎপর স্বাভাবিক মৃত্যু বা আপোষে পদত্যাগের পর ক্রমান্বয়ে সহোদর ভাই ফতেহ খান ও শের দৌলত খান, পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকবেন।

এখানে রাজা ফতেহ খানের বিষয়টি একটি জটিল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কের অবসানের সুত্র তাঁর সীলমোহরেই ব্যক্ত আছে, আর তা মঘী সনের সংখ্যার সঠিক পাঠের মাঝেই নিহিত। সঠিক পাঠ নির্ণয়ের অভাবে, এই বিতর্কটি জটিল রূপ ধারণ করেছে। সনটি মঘী, কিন্তু লেখা আরবী বর্ণে উৎকীর্ণ, এতদোভয়ই চাকমা ইতিহাসের আলোচক পন্ডিত মহলে প্রায় অপরিচিত। আলোচকদের এই অক্ষমতাকে বিবেচনা করে, কেউ কেবল অনুমানে ঐ ফহেত খাঁকে জালাল খাঁয়, কেউ তাঁকে শের মস্ত খাঁর পিতায় পরিণতি করেছেন। সনটিকেও স্থিরভাবে কোন একটি পঞ্জিকায় ধরে রাখা হয়নি।

আমার বিচারে সব কটি সীলমোহরেই মঘী সন ব্যবহৃত হওয়ায়, ফতেহ খাঁর সীলমোহরের সনটি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। লেখার মাধ্যম আরবী বর্ণ, সমানভাবে সব কটি সীলমোহরে অনুসৃত হওয়ায় এবং নাম ও খেতাবে সমানভাবে ইসলামী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন থাকায়, সনটি অব্যতিক্রমীভাবে মঘী। এই হিসাবে তাঁর সময়কাল স্থির হয় ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ। একটি প্রত্যক্ষ প্রত্ন নিদর্শনকে অস্বীকার করার মত অধিক শক্তিশালী যুক্তির উপস্থিতি ছাড়া তাকেই সত্য বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং তিনি শের দৌলত খাঁর আগে রাজ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

সীলমোহরগুলো সঠিক তথ্য জ্ঞাপনকারী পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ক্ষমতার প্রতীক। এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতার কাল নির্ণয় করে। তাতে ব্যবহৃত বর্ণ সংখ্যা ও ধর্মীয় বাক্যগুলো তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতাকে স্পষ্ট করে। মোগল আমলের শেষ থেকে বৃটিশ আমলের প্রথমাংশ জুড়ে প্রায় শতাব্দীকাল সময় এই সীলমোহরগুলোর ব্যবহার কাল নির্ণীত হয়। তাতে ব্যবহৃত সংখ্যা ও বর্ণগুলো আরবী তবে পঞ্জিকাটি মঘী। প্রাপ্ত নামগুলোর মাঝে শুকদেব রায় বাহাদুর বাদে অবশিষ্ট আটটি খাঁটি মুসলিম, চরিত্র সম্পন্ন। এই নাম ও পদবিগুলো আরবী ফার্সি ও তুর্কি ভাষাজাত। কোন একটি নাম পদবিও ভিন্ন নয়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা বর্ণ ও নামকরণ পদ্ধতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সীলমোহরগুলোতে তা ব্যবহৃত হয়নি। স্থানীয় বাংলা ও ঔপনিবেশিক ইংলিশ ভাষাটিও তাতে অবহেলিত হয়েছে। সীলমোহরে ধর্মীয় আনুগত্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। তবু তা ঘটায় মনে করা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্মানুরাগ ক্ষমতার মতো উল্লেখযোগ্য ছিলো। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগতাড়িত ছিলেন। চাকমাদের বর্তমানে আচরিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস, একটি সীলমোহরেও স্থান পায়নি। শের জব্বার খাঁর সীলমোহরে উল্লেখিত বর্ণ,

ইসলামী বাক্য , নাম ও পদবি, তাদের পারিবারিকভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রতীক। এই ধর্মীয় ঐতিহ্য পরবর্তী জব্বার খাঁ ও তার ছেলে ধরম বখশ খাঁয় এসে ধর্মীয় বিকৃতি রূপে কালি ভক্তির আকারে আংশিকভাবে হিন্দু ধর্মীয় অনুরাগের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। এটা ধর্মান্তর বা ধর্ম বিকৃতি হতে পারে। তবে তাদের লেবাসী মুসলিম চরিত্র অক্ষুণ্নই ছিলো। এই মুসলিম চরিত্রের পাশাপাশি তৃতীয় গুরুত্বপুর্ণ তথ্য হলোঃ তারা মূলতঃ আরাকানের রোসাংবাসী ছিলেন। শের জব্বার খাঁর সীলমোহরটি এটা লিখিতভাবে ব্যক্ত করে। সংখ্যাতত্বীয় ব্যাপারটিও সন্দেহ মুক্ত। অধিকাংশ রাজা বৃটিশ আমলবাসী হওয়ায় সরকারী রেকর্ডপত্রে তাদের অনেকের কার্যকাল খ্রীস্টাব্দে নির্ণীত আছে, যার ভিত্তিতে সীরমোহরীয় সংখ্যাগুলো মঘী পঞ্জিকাভুক্ত সন বলে নিশ্চিত হয়।

৫। তথ্য বিভ্রান্তি।

চাকমা ইতিহাসের বহু কিছুই উহ্য, মনগড়া আর অতিরঞ্জিত। রাজা ফতেহ খাঁর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাঁর সীলমোহরে 'আল্লাহ রাব্বি' লেখা ইসলামী বাক্য থাকার কথা, এমনি একটি আজগুবী দাবী। বাস্তবিক পক্ষে রাজা শের জব্বার খাঁর সীলমোহরেই ঐ বাক্যটি উৎকীর্ণ পাওয়া যায়। ফতেহা খাঁ ও নুরুল্লাহ খাঁকে নিয়ে, আরেক বিভ্রান্তি হলো ঃ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়কালে ঢাকার সুবাদার ছিলেন ইব্রাহিম ফতেহ জং এবং নুরুল্লাহ ওরফে মীর্জা নুরুদ্দিন, ১৬২১/২২ খ্রীষ্টাব্দ সালে ত্রিপুরা রাজ্য জয়ের সাথে তারা জড়িত ছিলেন। নুরুল্লাহকে তথায় জায়গীর মঞ্জুর এবং শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুবাদার খোদ ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর সফর করেছিলেন। ঐ নুরুল্লাহ পূর্ববর্তী সুবাদার, কাসিম খানের সময়, মোগলদের আরাকান অভিযানের অন্যতম সেনাপতি ও ছিলেন। নামের সাদৃশ্য গুণে তাদেরকে কেউ কেউ চাকমা ইতিহাস খ্যাত ফতেহ খাঁ ও নুরুল্লাহ খাঁ বলে সন্দেহ করে থাকেন। কিন্তু আসলে তাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান তো আছেই, নামেও বিস্তর ভিন্নতা বিদ্যমান। নামের সামান্য সাদৃশ্য তাদের অভিন্ন হওয়ার পক্ষে যুক্তি নয়।

বলা হয়ে থাকে, যুবরাজ বিজয়গিরি রাজা সম্বুদ্ধের পুত্র, এবং উদয় গিরি তার সহোদর ভাই। ত্রিপুরা ইতিহাসে হুবহু এই দুই নামের রাজপুরুষ বিজয় মানিকা আর উদয় মানিক্য থাকায় ত্রিপুরা অনুরাগী কারো কারো ধারণা, চাকমাদের ইতিহাসে ঐ নাম ও তাদের উপাখ্যানটি ধার করা। যেহেতু চাকমারা অতীতে ত্রিপুরার বাসিন্দা ছিলো এবং ত্রিপুরাদের আরাকান অভিযানে, সৈন্যের আকারে তাদের শরীক থাকাও সম্ভব, সেহেতু তাদের দ্বারা ঐ নাম ও উপাখ্যানের ছিনতাই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই হওয়ার ধারণাটি একটি সন্দেহ মাত্র। নামে মিল হলেও উপাধিতে দুস্তর ভিন্নতা বিদ্যমান। গিরি উপাধি ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত নেই। ত্রিপুরা নায়কদের সময়কাল ইতিহাসের আলোকে নির্ণীত আছে, কিন্তু ঐ দুই চাকমা নায়কের সময়কাল নির্ণীত

নেই। সুতরাং নামের সাদৃশ্যকে আকস্মিক ব্যাপার বলা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য এমনিতে চাকমা ইতিহাস, বিভ্রান্তি আর অতিরঞ্জনে পূর্ণ। তাতে কিছু বিশ্বাসযোগ্য সত্যও নিহিত আছে, যা ভুবন বাবু বর্ণিত উপাখ্যানের ভৌগোলিক বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হয়।

চাকমা ইতিহাসের অন্যতম জাজ্জ্বল্যমান বিভ্রান্তি হলো ঃ লোকগীতিতে রাধা মোহনকে, যুবরাজ বিজয়গিরির সেনাপতি ও আরাকান বিজয়ী বীরের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি রাজা ভুবন মোহন রায়ের বর্ণনায় শের মাট্যা নামক ভিন্ন রাজার সেনাপতি। এমনি বিজয় গিরির পিতা ও ভাই এর নামের বর্ণনায় কখনো উদয় গিরি ভাই আর সময় গিরি পিতা, আবার কখনো সময় গিরি ভাই ও উদয়গিরি পিতা বলা হয়েছে। ভুবন বাবুর মতে বিজয়গিরির পিতার নাম সম্বুদ্ধ।

৬। রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত চাকমা রাজ পরিবার।

আলোচনার প্রয়োজনে এখানে রাজ তালিকাটি উপস্থাপন করা হল, যা পৃথক তিন বংশে বিভক্ত। সুত্র ঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস।

ক) প্রথম রাজবংশ। রাজ্য ও রাজধানী কল্পনগর। (অজ্ঞাত স্থান)

১।	রাজা ঃ	শাক্য	(পিতা)
২।	রাজা ঃ	সুধন্য	(পুত্র)
৩।	রাজা ঃ	লাংগলধন	(পুত্র)।
৪।	রাজা ঃ	সুদ্রজিত	(পুত্র)
৫।	রাজাঃ	সমুদ্রিত (পুত্র)	নিঃসন্তান)

(খ) দ্বিতীয় রাজবংশ। রাজ্য ও রাজধানী চম্পক নগর (অজ্ঞাত স্থান)

৬/১	রাজাঃ	শ্যামল	(পূর্ববর্তী রাজার মন্ত্রী)
৭/২	রাজা ঃ	চম্পাকলি	(পুত্র)
৮/৩	রাজা ঃ	সাধন গিরি	(ঐ)
৯/৪	রাজা ঃ	চেঙ্গিয়াসুর	(ঐ)
১০/৫	রাজা ঃ	চান্দা সুর (ঐ)	
১১/৬	রাজা ঃ	সুমেসুর (পুত্র)	

১২/৭ রাজা ঃ ভীমঞ্জয় ঐ)

১৩/৮ রাজা ঃ সম্বুদ্ধ (ঐ)

১৪/৯ রাজা ঃ বজয়গিরি [(নিঃসন্তান) (পুত্র)]

(গ) তৃতীয় রাজবংশ ও রাজধানী ঃ মইসাগিরি আরাকান

১৫/১ রাজা ঃ জনৈক সৈনিক

১৬/২ রাজা ঃ মানিক গিরি ঃ (নাতি) (মা

মানিবি পিতা বাঙ্গালী সর্দার)

১৭/৩ রাজা ঃ মাদালিয়া (পুত্র)

১৮/৪ রাজা ঃ রামা থংজা
(ঐ)

১৯/৫ রাজা ঃ কামাল চেগা
(ঐ)

২০/৬ রাজা ঃ রতন গিরি
(ঐ)

২১/৭ রাজা ঃ কালা থংজা
(ঐ)

২২/৮ রাজা ঃ শের মাটিয়া (মাট্যা)
(ঐ)

২৩/৯ রাজা ঃ অরুণ যুগ
(ঐ)

২৪/১০ রাজা ঃ চান্দু থংজা ওরফে ঘাওটিয়া বা ঘাট্যা (ঐ পুত্র)

২৫/১১ রাজা ঃ মাইসাং (পুত্র)

২৬/১১ রাজা ঃ মারিকিয়া (ঐ)

২৭/১৩ রাজা ঃ রদংছা ওরফে কদম থংছা (ঐ)

২৮/১৪ রাজা ঃ তিন সুরেস্বরী (ঐ)

২৯/১৫ রাজা ঃ জানু (পুত্র)

৩০/১৬ রাজা ঃ সাথুয়া (নাতি)

কথিত পাগলা রাজা (মা রাজেম বি, পিতা বুড়া বড়ুয়া) ৩১/১৭ রাজা

ঃ ধাবানা (নাতি) মা অমঙ্গলী

পিতা মুলিমা থংজা

৩২/১৮ রাজা ঃ ধারা মিয়া (পুত্র)

৩৩/১৯ রাজা ঃ মোগল্যা/মোগালা (মোগল) (ঐ)

৩৪/২০ রাজা ঃ ফতেহ খাঁ (ভাই)

৩৬/২২ রাজা ঃ শের মস্ত খাঁ (পুত্র)

৩৭/২৩ রাজা ঃ শুকদেব রায়

(শের মস্ত খাঁর পোষ্য পুত্র)

৩৮/২৪ রাজা ঃ শের দৌলৎ খাঁ পিং রহমত খাঁ (জ্ঞাতি)

৩৯/২৫ রাজা ঃ জান বখশ খাঁ (পুত্র)

৪০/২৬ রাজা ঃ জব্বার খাঁ (ঐ)

৪১/২৮ রাজা ঃ ধরম বখশ খাঁ (পুত্র)

৪৩/২৯ রাণী ঃ কালিন্দি বিবি (স্ত্রী),

৪৪/৩০ রাজা ঃ হরিশ চন্দ্র রায় [(মা মেনকা ওরফে চিকন বিবি, পিং ধরম বখশ খাঁ (নাথি)]

৪৫/৩১ রাজা ঃ ভুবন মোহন রায়

৪৬/৩২ রাজা ঃ ১ নলিনাক্ষ রায় (ঐ)

৪৭/৩৩ রাজা ঃ ত্রিদিব রায় (ঐ)

৪৮/৩৪ রাজা ঃ দেবাশীষ রায় (ঐ)

রাজা হরিশ চন্দ্র রায়ের মাতৃকুলের গোষ্ঠী পুরাকুট্যা কিন্তু পিতৃকুল হল ওয়াংঝা। এখানে পিতৃগোত্র প্রদর্শিত হল ঃ

গুনাই ওয়াংঝা (পিতা)

(১) কবা (২) গজা (পুত্র)

ওয়াংঝা (পিং কবা)

(১) ভলা পাথর (২) গাভূর ওয়াংঝা (পুত্র)

(১) বুন্দার খাঁ (২) রনু খাঁ (পিং ভলা পাথর)

(১) চন্দর খাঁ (২) রতন খাঁ (পিং বুন্দার খাঁ)

(১) মল্লাল খাঁ (২) বল্লাল খাঁ (৩) জালাল খাঁ (পিং চন্দর খাঁ)

গোপি নাথ পিং মল্লাল খাঁ (স্ত্রী ঃ রাজকন্যা চিকন বিবি, পিং ধরম বখশ খাঁ)

রাজা ঃ হরিশ চন্দ্র রায় (পুত্র)

দেখা যায় এদের অধিকাংশ মুসলিম নাম উপাধিতে পরিচিত। রাজা হরিশ চন্দ্রের দাদা মল্লাল খাঁ ও শ্বশুর রত্ন খাঁ দেওয়ান, তাদের উর্ধ পুরুষদের অনেকের পরিচয় ও খাঁ। মনে হয় বৃটিশ আমলের অসুমলিম প্রভাবের ফলেই রাজা হরিশ চন্দ্র থেকে অমুসলিম নামও খেতাবের ধারা প্রবর্তিত। নতুবা ভাষা আর রাজ আচরণের মত, মুসলিম নাম করণ ঐতিহ্য, এখনো চাকমা অভিজাত সমাজে অনুসৃত হতো। পূর্ববর্তী বিকৃত আর অর্থহীন নামগুলোকে কোন ভাষার গন্ডিতে ফেলা যায় না। তবে কিছু নামের সাথে সংযুক্ত মঘী উপসর্গের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তারা মগ প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, এবং ওদের মিশ্রভাষী, বিকৃত সম্বোধনই নামের বিকৃতি ঘটিয়েছে। তবে চাকমাদের নিজ সমাজে ও রাজপরিবার সুত্রে অবিকৃত মূল নামও উপাধিগুলো না থাকা গোলমেলে।

যে তিনটি বংশের রাজ তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার নামগুলো সুন্দর অর্থবহ, অবিকৃত ভারতীয় এবং কোন একটিও বিদেশী ভাষাজাত নয়। গাম্ভীর্য্য আর শ্রুতি মধুরতার গুণেও, নামগুলো রাজ মর্যাদার সাথে মানানসই। তাতে এই মূল্যায়নই করা যায় যে, ঐ লোকজন ভারতীয় উপমহাদেশভুক্ত কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন, তাই নামে ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের উত্তর পুরুষ এখনকার বাংলাদেশী চাকমা বাসিন্দাদের মুখের ভাষা, অতীত পুথি পুস্তকের ভাষা, এবং লোকগীতি ও প্রবাদ প্রবচনের নতুন ও পুরাতন

ভাষার আলোকে বলা যায়, আঞ্চলিক বাংলার এক মিশ্রিত রূপই চাকমা ভাষা। বিশেষতঃ মুসলমানী বাংলা, চাকমা ভাষায় আত্মস্থ হয়ে আছে। এই যোগাযোগ ও সাদৃশ্য বিস্ময়কর। লক্ষ্য করার বিষয়, ভাওয়াইয়া গানের ক্রিয়ারূপ ও চাকমা ভাষার ক্রিয়া গঠন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। সর্বনামের বেলায় প্রায় পার্থক্য নেই। নামের শেষের ধন, জিত, গিরি, সুর ইত্যাদি উপসর্গগুলো উত্তর ভারতীয় রীতিজাত। কোন চাকমা কারো প্রতি কুপিত হলে, তাকে মগধা বলে তিরস্কার করে, তাতে অনুমান করা যায়, মগধ নামীয় অপ্রিয় স্থানটির সংস্পর্শে একদা তাদের অবস্থান ছিলো, এবং সম্ভবতঃ ওখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সুদূর অতীতে উৎপীড়িত হয়েছে। যেমন বাঙ্গালীরা অতীতের অত্যাচারী বর্গীদের কথা উষ্মার সাথে এখনো স্মরণ করে, এবং এখনো ছড়া কাটে, 'ছেলে ঘুমালো পারা জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।' তবে তৃতীয় রাজবংশের নাম ও পদবি পূর্বানুসৃত ধারার ব্যতিক্রম। দ্বিতীয় রাজবংশ পর্যন্ত নাম উপাধিগুলো অনেকাংশে অমুসলিম ভারতীয়। তৃতীয় বংশীয় বাঙ্গালী সর্দার স্বরূপেই বাঙ্গালী। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজার পক্ষে, নিজের মেয়েও জামাতার মত মুসলিম নামানুসারী হওয়াই সম্ভব। তৎপর তাদের পরবর্তী মানিক গিরি নামে ও খেতাবে পারিবারিক গন্ডিতে পড়েন। এরপর দীর্ঘ বিকৃত নামের তালিকার সাথে মঘী উপসর্গ আর উপাধির সংযোগে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যার মূলোদঘাটন অসম্ভব না হলেও কষ্টকর। তবে লুকিয়ে থাকা অমুসলিম নাম খেতাব আর উপসর্গগুলো, সে মূলোদঘাটনের সহায়ক। তা থেকে উদ্ভুত বিকৃত নাম ও উপাধিগুলো বিজাতীয় উচ্চারণ ও সংমিশ্রণের ফল। অনেক ক্ষেত্রে বিজাতীয় লেখক ও কর্তৃক বর্ণনান্তর ঘটিত বিভ্রাটে, বিকৃতিগুলো জটিল হয়েছে। তবু বাঙ্গালী, সর্দার, বিবি, মানিক, শের, রতন, খাঁ, কামাল ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে মুসলিম চরিত্র পরিস্ফুটিত হয়। ঐ নামগুলোর অমুসলিম মূল উদ্ভাবনের কোন উপায় নেই। তবে ভিন্ন চিন্তা অবান্তর। যদি ধরে নেওয়া যায়, মিশ্রভাষী নামগুলো সরাসরি ও পরিষ্কার মুসলিম চরিত্রযুক্ত নয় বলে অমুসলিম, তা হলে তার আগের ও পরের সরাসরি মুসলিম নাম ও উপাধিগুলোর সাথে সেগুলো কোন সামঞ্জস্য থাকে না। বিকৃত আর অর্থহীন নাম উপাধি, অজ্ঞ আর সাধারণ লোকের পক্ষেই ধারণ করা সম্ভব। গর্বিত মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের অলংকারপূর্ণ গম্ভীর নাম উপাধি ধারণের নজির খোদ ঐ রাজবংশেই বিদ্যমান। অর্থহীন ও সংগতিহীন বলেই অমুসলিম নাম উপাধিগুলো তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অযোগ্য। আর এ কারণেই উদঘাটিত মুসলিম নাম উপাধিসমূহ, ঐ বিকৃত নাম উপাধিগুলোর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য। আসলে বিকৃত নাম উপাধিগুলো মৌলিকভাবে মুসলিম চরিত্র সম্পন্ন। তা রাজকীয় মর্যাদার সাথেও সঙ্গতিশীল। পরিচয় জ্ঞাপক অযোগ্য নাম উপাধিতে উপহাস্য হওয়া কোন রাজপুরুষের পক্ষেই মানানসই নয়। সুতরাং এই মূল্যায়নের দ্বারা সঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায় যে, তৃতীয় চাকমা রাজবংশের প্রথম সতের জন রাজা, তাদের রাজকীয় মর্যাদার পক্ষে সংগতিপূর্ণ নাম ও উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, অথবা তারা আদৌ রাজা বা মর্যাদাসম্পন্ন কেউ ছিলেন না, যা তাদের অর্থহীন বিকৃত নাম

উপাধিতে বিবৃত হয়। সম্ভবতঃ কোন ক্ষমতাধর উচ্চাভিলাষী বংশধর, নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও কৌলিন্যের উচ্চাশা পূরণার্থে রাজ তালিকাটি রচনা বা বর্ধিত করেছেন। অনুরূপভাবে অসন্তুষ্ট বিদ্বিষ্ট কেউ মুসলিম নাম পদবিতে, বিকৃতি ঘটিয়েছেন। যে কারণে দেশী বিদেশী সাকুল্য রাজসংখ্যা, এখন আটচল্লিশের আরো বেশী এক বিরাট সংখ্যায় উপনীত। এই বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ঘটনা হলো রাজক্ষমতার দাবীদার ধাবানা কর্তৃক তৈনছড়িতে বাঁশের সিংহাসন ব্যবহার, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধূর্য্যা কর্তৃক স্ত্রীর বক্ষবন্ধনীর দ্বারা মাথায় পাগড়ি বাঁধন, এবং রাজপরিবারের মেয়েদের লাকড়ি কাটা ও মাছ ধরা ইত্যাদির যে বর্ণনা বিভিন্ন উপাখ্যান ও কিংবদন্তিতে আছে, তা অতি সাধারণ লোক হওয়ার প্রতীক।

বিকৃত নাম পদবিধারী রাজাদের বংশে অনেক উত্তরপুরুষ সরাসরি খাঁটি আর অবিকৃত নাম ও খেতাবে পরিচিত। তাতে তাদের বাপ দাদাদের পরিচয় সন্দেহমুক্ত হয়, যথা ঃ দশম পুরুষ রাজা চান্দুর দুই বোন সোনা বি ও মানিক বি ও ষোড়শ পুরুষের দুই ছেলে চানান খাঁ ও রতন খাঁ ইত্যাদি।

বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়, চাকমারা কল্পনগর ও চম্পকনগর বসবাসকালে, ধন, জিত, সুর, গিরি ইত্যাদি নাম বিশেষণ ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের আভিজাত্যের পরিচয় দিচ্ছেন। আরাকান থাকাকালে তারা ব্যবহার করেছেন থংজা, চেগা ও এবং অনুস্বর বর্ণীয় মঘী উপসর্গ, এবং মুসলিম বাংলায় বেছে নিয়েছেন ঃ মিয়া, বিবি ও খাঁ উপাধি। আবার ইংরেজ আমলের হিন্দু প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে রায়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। এটা তাদের পরিচয় বদলের পারঙ্গমতার নজির।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায়, তৃতীয় বংশের প্রথম সতের জন রাজার নাম পদবি খাঁটি মুসলিম মূল থেকে বিকৃত। তাদের বংশধর পরবর্তী দশজন রাজা, রাণী খাঁটি মুসলিম নাম ও পদবিতে পরিচিত। ধর্মতঃ তাদের অমুসলিম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ নাম ও উপাধি বদলের মত ধর্ম বদলের ঘটনাও ঘটেছে, যদ্দরুণ এখন তারা বৌদ্ধ। তৃতীয় রাজবংশের রাজাদের সংখ্যা এ পর্যন্ত মোট চৌত্রিশে উপনীত। পূর্বাপর বংশগুলোর হিসাবে এই সংখ্যা এখন সর্বমোট আটচল্লিশ বা আরো বেশী দেখা যায়, প্রথম দুই বংশের রাজাদের ও তৃতীয় বংশের শেষাংশের রাজপুরুষদের নাম ও উপাধিগুলো অত্যন্ত জমকালো, অর্থপুর্ণ, আর সুন্দর, এবং সবকয়টি সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাজাত। কিন্তু তৃতীয় বংশের সৈনিক রাজা ও তার বংশধরদের প্রথম সতেরটি নাম ও উপাধি বিভ্রান্তিকর। এদের বিকৃত আর অবিকৃত নাম উপাধিতে নিহিত কিছু মুসলিম চরিত্র, ব্যাপারটিকে বিতর্কিত করে তুলেছে। মনে হয় আসলে এই নামগুলো মুসলিম নামের বিকৃতি, এবং তারা নিজেরাও ধর্মতঃ মুসলমান ছিলেন। সৈনিক রাজা ও তার জামাতার নাম সংস্কৃত, দেশী, বা মঘী হলে, এবং ঐ সৈনিক রাজার মেয়ে মানিক বি ও তাঁর পরবর্তীদের কারো কারো ইসলামী নাম উপাধি না থাকলে, সন্দেহের সৃষ্টি হতো না। গভীর যাচাই বাছাই অধিকাংশ

নামের মুসলিম চরিত্রকে উদঘাটিত করে। কিছু নাম ধর্ম নিরপেক্ষ এবং দুটি নাম সংস্কৃত বা দেশী বলে ভ্রম হয়। মনে হয় তার কিছু বিকৃত ও কিছু লিখন ভাষান্তর ও বানান বিভ্রাটের ফল।

তৃতীয় বংশের ৩০তম পুরুষের সময় পুনরায় নাম উপাধির অমুসলিম ধারা শুরু। তখন সংস্কৃতধর্মী নামকরণের পুনরারম্ভ। মধ্যবর্তী শুকদেব অরাজ বংশজাত পোষ্যপুত্র। হিন্দু বা বৌদ্ধ চরিত্র তার নামেই পরিস্ফুটিত। কারো কারো মতে তিনি আদৌ রাজা ছিলেন না, পালক পিতার জীবদ্দশায়ই মারা গেছেন। সম্ভবতঃ তিনি জমিদার ছিলেন।

৭। নাম বিকৃতির মূলোদ্ধার।

রাজা ভুবন মোহন রায় বর্ণিত সুত্রে, রাজাদের সংখ্যা পূর্বাপর মোট আটচল্লিশ জন। একুশজন রাজা পরিষ্কার অমুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত। বাদ বাকি সাতাশ জনের ১৯ তম রাজা কামাল চেগা, এবং ৩২ তম রাজা ধারা মিয়া থেকে রাজা ধরম বখশ খাঁসহ মোট এগারজন পরিষ্কার মুসলিম নাম ও খেতাবের অধিকারী। অবশিষ্ট ষোলজন রাজার নাম পদবি মুসলিম মূল থেকে বিকৃত মর্ষী। এই বিভ্রান্তি রহস্যের জাল অপসারণ করা গেলে, রাজাদের মুসলিম তালিকা সাতাশে পৌঁছে। অবশ্য তাদের ইসলামী ধর্মানুসরনের একাধিক নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এখানে শুধু নাম ও পদবির দ্বারাই ধর্মীয় বিভাজন নির্ধারিত হলো। নাম পদবি, ধর্মীয় পরিচয়ের বাহ্যিক শক্তিশালী সুত্র। তাকে অবহেলা করা যায় না। সীলমোহরে প্রাপ্ত অতিরিক্ত তিনটি নাম এই তালিকার সাথে যুক্ত হলে মোট মুসলিম নামীয় রাজা হোন সংখ্যায় তিরিশ জন। অবস্থানগত বিচারে প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ বিদেশী, এবং তৃতীয় রাজবংশ আংশিক আরাকানী বর্মী, আর আংশিক বাংলাদেশী। এখানে তৃতীয় রাজবংশ ও তার স্ব-সমাজের লোকদের ধর্ম আর জাতিত্বের প্রশ্নটি মীমাংসাযোগ্য।

তৃতীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ সৈনিক রাজাকে কেউ কেউ সকলিয়া নামে অভিহিত করে থাকেন। ব্যাখ্যা করা হয়, চাকমা জনসাধারণের দ্বারা তিনি নির্বাচিত, তাই ঐ কার্যকারণ জ্ঞাপক নামে তিনি সকলিয়া সম্বোধিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি যথার্থ নয়। চাকমা ভাষায় জনসমষ্টিকে সকল বলা হয না। কয়েকটি চাকমা বারমাসী গানে মিশ্র বাংলা এবং রাণী কালিন্দি প্রদত্ত একটি পাট্টায়ে মুন্সিয়ানা বাংলার ব্যতিক্রমী ব্যবহার পাওয়া গেলেও, তাদের সামাজিক ও সাহিত্যের ভাষা, তা থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন। সকলিয়া নামটি চাকমা রাজপরিবার সুত্রে ও সমর্থিত নয়। সুতরাং নামটি কোন অতি উৎসাহী ব্যক্তি কর্তৃক কল্পিত বা উদ্ভাবিত বলেই ভাবা যায়।

সৈনিক রাজার নামহীন হওয়া অবশ্যই রহস্যজনক। একজন রাজপুরুষের ও বংশের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে নাম পরিচয়হীন থাকা বিস্ময়কর। সামগ্রিক রাজ তালিকায় তাঁর ক্রমিক অবস্থান অক্ষুণ্নআছে। এমতাবস্থায় তার নামহীন থাকার ঘটনা কোন দুর্ঘটনা জাত ভাবা ও যায় না। এই নামটি অনভিপ্রেত হওয়ার দরুণ কোন অসন্তুষ্ট লিপিকার বা উত্তরাধিকারীর ইচ্ছাকৃত ছাটাই ব্যবস্থায়, তা বাদ পড়ে গেছে। রাজ পরিবারের সামগ্রিক ঐতিহ্যকে, কোন মতেই খাটো করে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে প্রমাণের অবশিষ্ট সুত্র হলো উত্তরসুরী বংশধরদের নাম খেতাব আর খান্দানী ঐতিহ্য যা অনেক ঐতিহাসিক বিভ্রাটের সমাধানের পক্ষে সহায়ক। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা নিজ মা মানিক বি'র নামানুসারে মানিক এবং প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিজয় গিরি থেকে ঐতিহ্যানুগ গিরি উপাধি লাভ করেছেন। লক্ষ্যনীয় যে, এই মানিক গিরি পর্যন্ত তৃতীয় বংশের তিন পুরুষ পর্যন্ত, নাম পরিচয়ে তাদের ধর্ম আর জাতিত্ব পরিষ্কার নয়, এবং চতুর্থ পুরুষ রাজা মাদালিয়া থেকেই নাম বিভ্রাটের শুরু। এই নাম বিভ্রাটের ধারা ৩১তম পুরুষ ধাবানা পর্যন্ত প্রলম্বিত।

বলা যায় এই নাম বিকৃতি ও বিভ্রান্তির কারণ বহুবিধ, যার অন্যতম হলো চাকমা ভাষার কথন ও সংক্ষিপ্ত করণ রীতি। ভিন্ন উচ্চারণ ও কথন রীতির কারণে, শব্দের আসল রূপ অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ হলো তাদের দীর্ঘকাল বার্মা সীমান্তে ও তার অভ্যন্তরে মগ অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস, যদ্দরুণ বিজাতীয় সংমিশ্রণ ও সম্বোধনে, নাম পরিচয় ও ভাষায় বিরূপ প্রভাব পড়েছে। তৃতীয় কারণ হলো অতি উৎসাহী অসন্তোষ জনক বিচ্যুতি। এই শেষ কারণটাকেই চাকমাদের নিজস্ব ব্যবহার ও সংগ্রহে মৌলিকত্ব রক্ষিত না হওয়ার প্রধান হেতু জ্ঞান করা যায়।

চট্টগ্রামী আঞ্চলিক বাংলা আর চাকমা বাংলায়, নাম ও বিশেষণের সরলিকরণ পদ্ধতি, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন, আর অভিনব। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শব্দটি সংক্ষিপ্ত আর পরিবর্তিত ভিন্নরূপ ধারণ করে। মনে হয় তা আরেকটি মৌলিক শব্দ। উক্ত সরলিকরণ পদ্ধতিতে, তুচ্ছার্থে নাম ও বিশেষণে অনেক ক্ষেত্রে বর্ণপাত ঘটে, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শব্দের শেষে ইয়া উয়া যুক্ত হয়, এবং বহু শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, যথা ঃ রহিম>রম্যুয়া, দাড়িওয়ালা>দাজ্যা, পড় য়া> পরবুয়া, মেজবানী> মেজবান্যা, সাহস> সাস, জিন্দেগানী>জিনকানী, ফজর> পোর, নাম>নাং, হরিণ> হরিং ইত্যাদি। সুতরাং নাম বিকৃতিতে এ কথন রীতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

চাকমাদের দীর্ঘকাল মঘী অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থানহেতু, বিজাতীয় বিকৃত উচ্চারণে, তাদের সম্বোধিত হতে হয়েছে। সুতরাং এর প্রভাবে নাম বিকৃত হওয়া, আর মঘী উপাধির সংযোগ ঘটা সম্ভব। রাজা ভুবন মোহন রায় লিখিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসের মূল ইংলিশ ভাষ্য, বাংলায় ভাষান্তরিত হওয়ার বেলায়, অনেক বানান ও উচ্চারগত বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন রনুখাঁ হয়েছেন রুনা খাঁ ও কল্পনগর হয়েছে

কলাপা নগর ইত্যাদি। সুতরাং বিকৃতির এ কারণটিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় না। শেষ কারণটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিদ্বিষ্ট লিপিকার ও উত্তরাধীকারী কারো কারো দ্বারা বিকৃতি ও বিমোচন ঘটা ছাড়া, আসল নাম উপাধিগুলোর রক্ষিত না হওয়া, সম্ভব হতে পারে না। বিকৃতির পক্ষে বর্ণিত বিভিন্ন সম্ভাবনার আলোকে এখানে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি বিকৃত নাম আর উপাধির মুল সন্ধানী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, নিম্নাকারে উপস্থাপন করা যায়।

তালিকার প্রথম বিকৃত নাম হলো ১৭তম রাজা মাদালিয়ার। নামটির কোন ভাষা মূল পাওয়া যায় না বলেই বিকৃত। চাকমা সমাজে নামকরণ পদ্ধতি অলংকারমূলক, ও বিশেষণ বাচক হয় যথা ঃ মানিক গিরি ও অমঙ্গলী ইত্যাদি। সাধারন চাকমা সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্র বাচক নামই ধারণ করা হয়, যথা ঃ কেঁদো স্বভাব হলে কান্দ্রা, চুল রাঙ্গা হলে রাঙা চুলা, সূচালো মুখ হলে সূচ্যাং ইত্যাদি। বর্ণিত মাদালিয়া নামটিকে এরূপ কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। সম্ভবতঃ চুচ্ছার্থ জ্ঞাপক ইয়া প্রত্যয় যোগে তা মাদাল্যা ছিলো। ভাষান্তর বর্ণান্তরজনিত ঘটনায় তা হয়েছে মাদালিয়া। শব্দটি একজন গর্বিত রাজ পুরুষের নামের উপযোগী অর্থ আর অলংকার বহন করে না। রাজ তালিকাভুক্ত সুন্দর ও গম্ভীর নামগুলোর সাথে এটা সংগতিহীন। রাজ মর্যাদার সাথে মানানসই একটি ভিন্ন শব্দ মূলের সাথে তার সম্পর্ক থাকাই সম্ভব। সেরূপ সংগতিপূর্ণ ও সাদৃশ্যযুক্ত শব্দ হলো, আরবী আহমদ আলী অথবা মোহাম্মদ আলী যা থেকে মাদ আলী> মাদালী> মাদাল্যা> ও মাদালিয়া হয়েছে। এছাড়া নামটির অর্থপূর্ণ সংগতি বিধান অসম্ভব।

দ্বিতীয় বিকৃত নামটি হলো রামা থংজা। রামাকে বাহ্যত ঃ রাম শব্দের বিকৃতি ভাবা যায়। কিন্তু তার ছেলে আরবী নামধারী কামাল, এবং বাপ দাদাদের সবাই অমুসলিম উপসর্গ থেকে মুক্ত, মুসলিম নামধারী। তাই এই রামা নামেও মুসলিম চরিত্র স্বীকার্য্য। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নিম্নাকারে তা রহিম নামেরই অপভ্রংশ, যথা ঃ রহিম>রম্যুয়া>রামা। মঘী উপসর্গ থংজ্য। তার সাথে যুক্ত হয়ে রামা থংজা।

তৃতীয় নামটি প্রকৃত আরবী কামাল। তার সাথে চেগা একটি মঘী উপাধি। পরবর্তী রাজা রতন গিরি, সৌভাগ্যক্রমে অবিকৃত নাম ও খেতাবের অধিকারী। নামটি বাহ্যত ঃ ধর্ম নিরপেক্ষ। কিন্তু এটাও আহলাদী নাম হিসাবে বাংগালী মুসলিম সমাজে প্রচলিত। তার পক্ষে খান্দানী চরিত্রের অনুসারী হওয়াই সম্ভব। তাঁর আদূরে নামটি, ভিন্নধর্মী হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কালা থংজার ক্ষেত্রেও ভিন্ন সমীক্ষা খাটে না। পরবর্তী শেরমাটিয়া একটি সুন্দর আকর্ষণীয় নামের স্বল্প বিকৃত রূপ, যথা ঃ শের মস্ত>শের মস্ত্যা> শের মত্যা> তৎপর এই নামটিকে লিপিকারেরা শের মাটিয়া করে ছেড়েছেন।

অরুণযুগ নামটিতে বিকৃতির দ্বারা সংস্কৃতের চরিত্র আরোপ করা হয়েছে। ওটাকে খাঁটি অমুসলিম নাম বলে ভ্রম হয়। কিন্তু সন্তান ও বাপ দাদার মুসলিম গন্ডি থেকে

তাকে ভিন্ন ভাবা যায় না। এবং তাতে একটি অর্থপূর্ণ সুন্দর মুসলিম নামের অবস্থান লুক্কায়িত পাওয়া যায়। সে নামটি হলো হারুণ চাক, যা থেকে তার রূপান্তরের ধারা নিম্নরূপ, যথা ঃ হারুণ শেখ > হারুণ থেক> হারুণ চাক> আরুণ চাক> অরুণ চাক, অরুণযাক> ও অরুণ যুগ। উল্লেখ্য যে, আরাকান ও বার্মায় চাকমারা চাক বা থেক নামে অভিহিত। সেখানে চাকমা নামের, থেক বা চাকরাই কথিত রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর তিন ছেলে-মেয়ে, চান্দু থংজা, সোনা বি ও মানিক বি। চান্দ থেকে ডাক নামে চান্দু হয়েছে, যা সচরাচর সাধারণ মুসলিম নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুসলিম নামধারী বাপ ও দুই বোন থেকে তিনি ভিন্ন হতে পারেন না।

মাইসাং একটি মজাদার নাম। বাহ্যত ঃ শব্দটি মঘী। রাজা ভুবন মোহন রায়ের ব্যাখ্যানুযায়ী তার অর্থ বৌদ্ধ ভিক্ষু। কিন্তু এটির মঘী ও ভিক্ষু অর্থজ্ঞাপক হওয়া সন্দেহজনক। বাপ দাদার ইসলামী ঐতিহ্যের বাহিরে তার সহসা ভিন্ন ধর্মী গুরু হয়ে যাওয়ার কথা অতি উৎসাহী ব্যাখ্যা বলা যায়। চাকমা রাজ পুরুষদের মঘী উপাধি পাওয়া গেলেও, তাদের মঘী নাম গ্রহণের নজির আদৌ নেই। যদি এটিকে উপাধি বা ডাক নাম ধরা যায়, তবুও প্রশ্ন থাকে, আসল নামটি কি? তার পক্ষে নামহীন থাকা অসম্ভব। চাকমা ইতিহাসে তিনি একজন বিখ্যাত ও বহুল চর্চিত রাজা, যাঁর নামে লোকগীতি ও শ্রুতি কথা এখনো প্রচলিত আছে। তাঁর ক্রমিক অবস্থানটিও স্থির। সুতরাং এটা উপাধি জ্ঞাপক মঘী মাইসাং নয়, খান্দানী ঐতিহ্য অনুযায়ী এর পক্ষে কোন মুসলিম মুলের সাথে সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব। শব্দটির সাথে সামঞ্জস্যযুক্ত সুন্দর অর্থপুর্ণ আর রাজকীয় মর্যাদা সম্পন্ন সম্ভাব্য মুসলিম নাম সহজপ্রাপ্য, আর সে হলো ঃ মাহীশাহ। নামটি নিম্নকারে বিকৃত হয়েছে, যথা ঃ মাহীশাহ > মাইশা> মাইসাং। এরূপ 'ং' বর্ণযুক্ত রূপান্তরের উদাহরণ চাকমা ভাষায় ভুরি ভুরি বিদ্যমান যথা ঃ হরিং, সূচ্যাং ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম পালন না করার অভিযোগে, মগদের দ্বারা অভিযুক্ত আর আক্রান্ত হয়েছিরেন বলে তাকে বৌদ্ধ গুরু ভাবা যায় না।

চাকমা বর্ণনায় সম্মানিত রাজপুরুষ চান্দু থংজাকে কেউ কেউ ঘাট্যা বা ঘাওটিয়াও বলেছেন, এবং তার অর্থ করেছেন জলকর আদায়কারী বলে। এটা স্বকপোল কল্পিত একটি অপমানজনক নাম বা উপাধি। সরল অর্থে ঘাট মাঝি না বলে, জলকর আদায়কারী বলা নিরেট অপব্যাখ্যা। তিনি আসলেই চাঁদই হবেন , যা বাঙ্গালী মুসলিম নাম রূপে গ্রহনীয়। পরবর্তী বিকৃত নামধারী রাজা হলেন মারি কিয়া বা মারিক্যা। এটা একটি অদ্ভুত নাম। চাকমা ভাষায় এরূপ কোন শব্দ নেই। খান্দানী মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী তাকে মানিকের অপভ্রংশ ভাবা যায়। তার রূপান্তর নিম্নরূপ, যথা মানিক > মানিক্যা> মারিক্যা ও মারিকিয়া। এরূপ রদংছা নামটি অর্থহীন বিদঘুটে। কিন্তু আসলে তা একটি অত্যন্ত সুন্দর নাম রতন শাহ-এর বিকৃতি বলেই অনুমান করা যায়।

এই বংশের ২৮তম পুরুষের তিন সুরেশ্বরী নামটি বিকৃতির এক সেরা নমুনা। বাহ্যত ঃ তা অমুসলিম, তবে চরিত্রে স্ত্রীবাচক, যদ্দরুণ-এর মৌলিকত্ব সন্দেহজনক। স্ত্রী বাচক নাম একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাজ পুরুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। বাপ দাদার নামানুসারে ঐ নামটির তৈন শের হাজারী হওয়াই স্বাভাবিক। নিম্নরূপ বিকৃতির দরুণ তার রূপান্তর ঘটেছে, যথা তৈনশের হাজারী তৈন সেরাজারি> তিনসেরাজারি> তিন সুরেশ্বরী। তৈন হলো চাকমা ইতিহাস খ্যাত অঞ্চল। শের ফার্সি শব্দ মানে ব্যাঘ্র, হাজার সৈন্যের অধিপতি অর্থে হাজারী এটা মুসলিম রাজকীয় ঐতিহ্যানুগ নাম ও খেতাব।

জানু নামটি জাহানের সরল অপভ্রংশ। তার দুই মেয়ে সাজেম বি ও রাজেম বিম্বর মুসলিম নামানুযায়ী তিনি ও জাহান নামী মুসলিম হবেন, এর বিপরীত হওয়ার কোন উপসর্গই এখানে নেই। সাথুয়া কোন অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। একমাত্র সাধু শব্দ থেকেই তার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। তার তিন ছেলে-মেয়ে যথা-চানান খাঁ, রতন খাঁ আর অমঙ্গলী। অমঙ্গলী কোন আসল নাম নয় অবস্থা বাচক বিশেষণ। ভাইদের নামেই তার ধর্ম পরিচয় নির্ণীত হবে। বাপের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। সর্বাধিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এই তালিকার শেষ নামটি, যা বাহ্যতা ঃ অর্থহীন। আসলে নামটি মুসলিম দামান বা জামানের অপভ্রংশ, ধাবানা নয়।

এরপর দশজন রাজার নাম ও খেতাব বিভ্রান্তিমুক্ত খাঁটি মুসলিম। বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে উল্লেখ থাকায়, তাতে বিকৃতি ঘটান সম্ভব হয়নি। এটা বদ হজমের মত ঘটনা। তবে দুটি সীলমোহরে হিন্দু ধর্মীয় উপসর্গ পাওয়া ছাড়া, তাদের মাঝে ব্যাপক ধর্ম বিকৃতির উদাহরণ নেই। এরূপ শের জব্বার খাঁর সীলমোহরটি তার সরাসরি মুসলিম হওয়ার স্মারক।

এই আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় রাজবংশের মোট চৌত্রিশজন রাজার মধ্যে সাতাশ জনই মুসলিম নাম ও খেতাবে ভূষিত। সীলমোহরের দ্বারা তাদের দুজনের ধর্ম বিকৃতি ও শের জব্বার খাঁর ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়। সৈনিক রাজা ও অন্যান্যরা কোন ক্রমেই অমুসলিম ছিলেন বলে প্রমাণিত হয় না। এই রাজ তালিকার সাথে সীলমোহর খ্যাত সোনা বি, শের জব্বার খাঁ নুরুল্লা খাঁর ও ফতেহ খাঁ নাম যুক্ত হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, চাকমা সমাজে মুসলিম ভাষা, নাম, খেতাব, আচার-আচরণ ইত্যাদি ঐতিহ্যের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কার্যকারণ হিসাবে তাদের অনেকের সরাসরি মুসলমান হওয়া একটি সম্ভাবনা মাত্র। অনুকরণ, ধর্মান্তর ও বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেও তা ঘটা সম্ভব। চাকমা সমাজের অনেকে এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, রাজা ধারা মিয়া বা ধরম্যা জনৈকা মোগলকন্যার পানি গ্রহণ করায়, তার ছেলে পরবর্তী রাজা মোগল্যা বা মোঘল এবং তার বংশধর ধরম বখশ খাঁ পর্যন্ত রাজারা মুসলিম নাম খেতাবে ভূষিত এবং তাদের স্ত্রীগণ ও বিবি সম্বোধিত হয়েছেন। যেহেতু

তখন মুসলিম রাজশক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য ছিলো, তাই সাধারণ চাকমারাও তার অনুসরণ করেছে। কিন্তু যুক্তির কাছে এ দাবী টিকে না। ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া কোন বিজাতীয় পাত্রের সাথে কোন মুসলিম মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ঘটনার নজির এতদাঞ্চলে বিরল। কিন্তু বিজাতীয় মেয়েদের সাথে মুসলিম ছেলেদের বিবাহের ঘটনা ভুরি ভুরি। তজ্জন্য মুসলিম পাত্রের বিধর্মে ধর্মান্তর জরুরী নয়। অথচ সৈনিক রাজার মেয়ে মানিক বি থেকে এই ব্যতিক্রমের শুরু, যার অবস্থান হলো বহু পুরুষ আগে। সুতরাং ধারা মিয়া বা ধরম্যা হয় খোদ মুসলমান ছিলেন, অথবা ইসলামে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন, আর তখনই তার মাথে মোগল কন্যার বিবাহ হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাজার অনুকরণে সমাজে অনুরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। এই সম্ভাবনা ও স্বীকার্য যে, আরাকানের রোসাং রাজ্যাধিপতি ম্রাকু রাজবংশীয়রা অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুসলামানী নাম ও খেতাব ব্যবহার করেছেন। চাকমা সর্দারেরা ও সে দেশের তৎকালীন বাসিন্দা হওয়ার সুত্রে ইসলামী নাম ও পদবি ব্যবহারে, ঐ তাদের অনুকরণ করে থাকবেন। তাতে ধর্মতঃ মুসলিম হওয়া অপরিহার্য ছিলো না। কিন্তু চাকমাদের ব্যাপারে অতিরিক্ত উপসর্গ হলো, তাদের জবানে বিপুল ইসলামী পরিভাষাও গৃহীত হয়ে আছে, যা পরিষ্কার ইসলাম ধর্মীয় উপসর্গ। এটি মুসলিম সমাজ ও গৃহকোনের শিক্ষণীয় বিষয়। এটাকে অমুসলিম চরিত্র বলার উপায় নেই। সম্ভবতঃ তাদের মাঝে মুসলিম প্রজন্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে, যারা ছিলো ধর্ম ও সমাজ থেকে মুক্ত। মুসলিম অনুকরণে নাম উপাধি ধারণের নজির হাল জামানায় না ঘটায় এবং অতীতে তারা স্বল্পকাল মাত্র মুসলিম প্রভাবাধীন থাকায়, এ কথা ভাবার অবকাশ আছে যে, অভিজাতদের মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ অনুকরণজাত নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় একাত্মতা প্রসূত। এটি আরাকানী ঐতিহ্য হলে বিকল্প স্বকীয় নাম প্াশাপাশি ব্যবহৃত হতো, যা ম্রাকু অভিজাতদের দ্বারা অনুসৃত। এটাও বিস্ময়কর যে পৃথিবীতে এতো দীর্ঘ একক বংশীয় রাজ তালিকার এটা এক বিরল নজির। এ কারণে এটিকে উচ্চাভিলাষী সংযোজন ভাবার অবকাশ আছে।

৮। অনুসন্ধান

(ক) রাজা নগর পরিদর্শন :

পুরাতন চাকমা রাজবাড়ি, রাজানগর, চট্টগ্রামের উত্তর রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত। রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম সড়কের রাণীর হাট থেকে আমি ও উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের কর্মকর্তা জনাব জাফর হানাফী, একটি মোটর সাইকেলযোগে কাঁচা গ্রাম্য পথে অগ্রসর হই। সময় সম্ভবতঃ জুন বা জুলাই ১৯৯৩ সাল। আমাদের যাত্রা পথের চতুর্দিকে বাঙ্গালী জনপদ, সমতল কৃষিক্ষেত্র ও বিচ্ছিন্ন উঁচু নীচু টিলার সমাবেশ। এলাকাটি আধা পাহাড়ী। ইছামতী নদীটিও একে বেঁকে দক্ষিণমুখী চলমান। আমরা উভয়ই এ পথে নতুন, তাই পথে পাওয়া যাত্রীদের জিজ্ঞাস করে, গন্তব্যের হদিস জেনে নিচ্ছি। পূর্বে অদূরে উত্তরে-দক্ষিণে লম্বমান মানিকছড়ি পাহাড় শ্রেণী, হাতীর পিঠের মত উঁচু হয়ে দন্ডায়মান। ওপারে বিস্তৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম। পাহাড়টিকে মনে হয় একটি উঁচু দুর্লজ্ঘ্য প্রাকৃতিক দেওয়াল। ওপারের বন ও পাহাড়ের রহস্যঘেরা দেশটিকে যেন আড়াল করে ও পাহারা দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। এপারের সমতল ঘনবসতি পুর্ণ আবাদী অঞ্চলও তার বাসিন্দারা মিশ্র চেহারার বাঙ্গালী। মনে হয় তাদের পূর্বপুরুষেরা মাতৃ বা পিতৃ পক্ষে কেউ বাঙ্গালী ও কেউ মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাই গঠন ও গাত্র বর্ণ মিশ্রণ বৈচিত্র্য মন্ডিত। গোটা এলাকটির নাম রাজানগর ইউনিয়ন। মাইল খানেক পর ক্ষুদ্র টিলা ও খানা খন্দ মিশ্রিত অঞ্চলের শুরু। তারই এক অংশের নাম ফুল বাগিচা। স্থানীয় মুরুব্বী জনাব মৌলভী নুরুচ্ছফা জানালেন একদা অঞ্চলটি চাকমা রাজাদের প্রমোদ বাচিগা হিসেবে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ ছিলো। আজ ফুল বাগিচা নামটি মাত্র সে প্রাচীন প্রমোদ আয়োজনের স্মৃতি বহন করছে। রাণীর হাট, রাজানগর ও রাজারহাট সে যুগের চাকমা রাজা-রাণীদের স্মৃতিবাহী নাম। রাঙ্গুনিয়া নামটিও নাকি চাকমা রান্যা শব্দের অপভ্রংশ, যার অর্থ পরিত্যক্ত জুমভূমি। এলাকাটি পূর্বের পর্বতময় পাহাড়ী অঞ্চলের শেষ পশ্চিমাংশ। একদা এতদাঞ্চলে জুম চাষ সম্ভব ছিলো। এ ক্ষুদ্র টিলাময় আধাপাহাড়ী এলাকাটি দক্ষিণে কর্ণফুলি নদীতীর পর্যন্ত বেশ কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত। মৌলবী নুরুচ্ছফার কাছে আমরা কিছু গুরুত্বপুর্ণ তথ্যসুত্রের সন্ধান পেলাম ও তৎপর রাজারহাটের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। গ্রাম্য বাজার হলেও রাজারহাট বেশ বড়। বাজারে প্রবেশের মুখেই সড়কটির দু'পাশে দুটি বড় দীঘি। পশ্চিমে রাজবাড়ী। দু'দীঘির মাঝখানের চওড়া জায়গাটির উত্তর অংশ জুড়ে রাজা ভুবন মোহন উচ্চ বিদ্যালয়। মৌলবী নুরুচ্ছফা তার পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি। তার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষকের স্থলে সহকারী প্রধান

শিক্ষক মহোদয়ের সাথে দেখা করি। তাঁর কাছে আমাদের কাম্য তথ্যাদি না পেলেও কিছু তথ্য সুত্র, সাময়িক আপ্যায়ন ও একজন স্থানীয় গাইডের সহায়তা পাই, যাকে নিয়ে রাজবাড়ী এলাকায় অনুসন্ধান কাজ করা আমাদের পক্ষে সহজ হলো। লোকটি বয়সে তরুণ, তবে প্রাচীনকালের কথা-কাহিনী সম্বন্ধে বাপ দাদাদের সুত্রে কিছুটা ওয়াকিবহাল। আমরা জানতে চাই, রাণী কালিন্দি কর্তৃক রাজবাড়ী এলাকায় স্থাপিত যে সব মন্দির ও মসজিদ ছিলো, সেসবের অবস্থান কোথায় ও হাল অবস্থা কি? প্রাচীনকালের পাকা ইমারতাদি সম্বন্ধে ও আমরা খোঁজ নেই। কিন্তু লোকটি বয়সে তরুণ হওয়ায় এবং তার চেয়ে অধিক বয়স্ক বা বৃদ্ধ স্থানীয় অন্য লোকের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় আমরা হতাশই হই। তবু সে দেখায় পূর্বের দীঘির উত্তর পাড়ে একটি মসজিদ, যা বর্তমানে পুনর্নির্মিত হয়েছে। এটি রাজবাড়ী এলাকার একমাত্র মসজিদ। কিন্তু এর সাথে চাকমা জাতি নামীয় পুস্তক রচিয়ইতা সতিশ ঘোষের বর্ণনার অমিল দেখা যায়। তিনি লিখেছেনঃ মসজিদ টি রাজবাড়ির সামনকার দীঘির পাড়ে অবস্থিত। তাতে আজান ও নামাজ পড়ানোর জন্য রাণী খন্দকার নিযুক্ত করতেন। প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজ শেষে খন্দকার মৌলবী ও কাজি প্রভৃতিকে নিয়ে বাহিরের ঘরে ওয়াজ হতো এবং দুধের পায়েস সিন্নিতে সমবেত মুসল্লিরা আপ্যায়িত হতেন। অনুরূপ নানা স্থানে অবস্থিত মসজিদ সমূহের সাহায্যার্থেও অর্থ কড়ি পাঠান হতো। (দ্রষ্টব্য চাকমা জাতি পৃষ্ঠা ১১)

সন্দেহ করা সত্বেও আমরা মসজিদটি দেখে নিলাম। গাইড তরুণটির বর্ণনা অনুসারে মসজিদটির প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন অশ্বথ গাছের গোড়ায় কোন এক দরবেশের লাশ সমাহিত আছে। দীঘি সংস্কারকালে কোন এক সময় একটি তাজা লাশ আবিস্কৃত হয়। কোদালের আঘাতে যার কোন অঙ্গ কেটে যায়। তৎপর লোকজন ঐ লাশটি মসজিদ প্রাঙ্গণে পুনঃদাফন করেন। যার উপর বর্তমান অশ্বথ গাছটি বিদ্যমান। মনে হয় এই অংশটি পরে কবরস্থান হয়েছে। রাজবাড়ীর পূর্ব প্রান্তের প্রধান এই দীঘিটির পূর্বপাড়ের শেষ উত্তর অংশ হলো প্রাচীন কবরস্থান। তবে তাতে কোন সদ্য কবরের চিহ্ন নেই। এটা রাজাদের কবরস্থান হিসেবে অভিহিত অসংরক্ষিত। পার্শ্ববর্তী খন্দকার পাড়ার মুসলমানেরাও এটা ব্যবহার করেন না। মনে হয় মসজিদ সংলগ্ন দীঘিটি প্রাচীন।পশ্চিমের দ্বিতীয় দীঘিটি পরে খননকৃত এবং মসজিদটি ও মন্দিরের আগে নির্মিত। রাজবাড়ী অঞ্চলটি ইছামতি নদীর ইউ বাঁকের ভিতর পূর্ব পাড়ের সমতল নিয়ে গঠিত। রাণীরহাট থেকে আগত কাঁচা সড়কটি সামনের দু'দীঘির মধ্যবর্তী চওড়া খালি জায়গাটি হয়ে স্কুল দক্ষিণে হাটের উপর দিয়ে এগিয়ে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের সাথে যুক্ত হয়েছে।

আমরা পশ্চিমের দীঘির উত্তর পার হয়ে মন্দির এলাকাটির দিকে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণায় মাটির দেওয়াল ও টিনের ছানিযুক্ত একটি বিধ্বস্ত ঘর। এটা মন্দিরের সেবায়েৎ ও দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার। তৎপর পশ্চিমে

সর্ব উত্তরে পালি মন্দির নামের প্রথম পাকা ইমারতটি অবস্থিত। এ মন্দিরটিকে বর্তমান রাজা দেবাশীষ রায় কর্তৃক ১৯৮৬ সালে পালি টোলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন আকার ও ভঙ্গিতে গঠিত কিছু বৌদ্ধ মূর্তি স্থাপিত আছে। মূল বৌদ্ধ মূর্তিটি অবয়বে বিরাট। এখানে শ্রীমতি মনোমোহিনী রায়ের ব্যবহৃত একটি কারুকার্যময় খাট ও একটি ইজি চেয়ার রক্ষিত। মন্দিরটি চৌকোণ ও আধা তীক্ষ্ণ চূড়া সম্বলিত। হিন্দু মন্দিরের তীক্ষ্ণ চূড়ার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এটিতে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়নি। দীঘির পশ্চিমের চওড়া প্রাঙ্গণ জুড়ে পর পর এক সারিতে চারটি মন্দির অভিন্ন নির্মাণ কৌশলে স্থাপিত। তবে উত্তর ও দক্ষিণের দুটি একই আকারের বৃহৎ উপাসনালয় এবং মাঝের দুটি আকারে ছোট স্মৃতি মন্দির। দুই স্মৃতি মন্দিরের উত্তর পাশের প্রথমটি রাণী কালিন্দির স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজা ভুবন মোহন রায় কর্তৃক সংরক্ষিত এবং দ্বিতীয়টি, এ রাজাবাড়ীরই ছোট বৌ শ্রমিতি মনোমোহিনী রায়ের, যিনি রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় স্ত্রী, তথা রাজা ভুবন মোহন রায়ের সৎ মা ছিলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে রমণী মোহন রায় ও তার বংশধরেরা এই রাজানগরের রাজবাড়ী ও তার সম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও বর্তমান দখলদার। ১৮৭৩ খ্রীঃ সালে রাজা হরিশচন্দ্র রায় রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে এই রাজানগর ত্যাগ করায় এবং প্রথম পক্ষের ছেলে ভুবন মোহন রায় সর্দারীর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হওয়ায়, রাজা নগরের সম্পত্তি রমণী মোহন রায়ের ভাগে পড়ে। তিনি জীবদ্দশায় ছোট রাজা নামে খ্যাত ছিলেন।

স্মৃতি মন্দির দুটির ভিতরে বেদির উপর রানী কালিন্দি ও মনমোহিনীর ছোট আকারের মূর্তি স্থাপিত আছে। প্রথমটির দরজা শীর্ষে সিমেন্টের আস্তরে নিম্নোক্ত বাংলা ভাষ্যটি উৎকীর্ণ দেখা যায়, যথা ঃ

খ) 'রাণী কালিন্দি'

'ইনি মহারাজ ধরম বখশ খাঁর পাটরাণী। গুজাং দেওয়ান কালিন্দি রাণীর পিতা এবং কুরাকুট্যা সম্ভুত ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীঃ সালে (১১৯৪ মঘী/১২২৯ বাঙ্গালা) ধরম বকস খাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৪৪ খ্রীঃ (১২০৬ মঘী/১২৫১ বাঙ্গালা) চাকমা রাজ্য শাসন করার ভার বৃটিশ গর্ভনমেন্ট রাণীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি এই প্রকার ন্যায় ও দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন যে, চট্টগ্রামের সর্বত্র চিরকাল তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। প্রথমে হিন্দু ধর্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলো। পরে বৌদ্ধ ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ (১২৩১ মঘী/১২৭৬ বাঙ্গালা) ৮ই চৈত্র দিবসে রাণী কালিন্দি রাজা নগর রাজবাড়িতে পবিত্র চিঙ্গ (সীমা) স্থাপন করেন এবং পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের সংমিশ্রিত যে বাৎসরিক বিরাট মেলা বসিয়া থাকে, ইহা তাহারই কীর্তিস্তম্ভ। ইহার রাজত্বকালে বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। তিনি অতিশয় তেজোস্বিণী মেধাবিণী ছিলেন এবং স্বীয় কুল গৌরব ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজপুত মহিলাদের ন্যায় তাঁহার নিকট রাজ্যাপেক্ষা এমন কি প্রাণাপেক্ষা

অধিক প্রিয় ছিলো। এই কারণে তৎকালিন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন লুইন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। তাহাতে লুইন রাণীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোন এবং চাকমা রাজ্যের অধঃপতনের সুত্রপাত করিয়া যান। মান রাজার রাজ্যসৃষ্টি, বিশাল রিজার্ভ গঠন, কর্ণফুলী নদীর বহু আয়কর টেক্স ঘাট, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক খাসকরণ ইত্যাদি ক্যাপ্টেন লুইনের প্রতিহিংসার কার্য। রাণী কালিন্দির ১৮৭৩ খ্রীঃ (১২৩৫ মগী/১২৮০ বাঙ্গালা) ৫ই আশ্বিন তারিখে বাত রোগে রাজা নগর রাজপ্রাসাদে স্বর্গারোহণ হয় ইতি।

১লা জানুয়ারী ১৯১০ ইং
(লেখক) শ্রী ভুবন মোহন রায়

১৭ই পৌষ ১২৭১ মঘী

চাকমা রাজা

২৪৫৩ বুদ্ধাব্দ ১৩১৬ বাঙ্গালা

এবার আমরা সারির চতুর্থ ও শেষ মন্দিরটিতে পৌঁছলাম। সেটি মুহামুনি মন্দির নামে রাণী কালিন্দি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। এটা ও পাকা চৌকোণ ও আধা তীক্ষ্ণ চূড়া সম্বলিত। এর ভিতর স্থাপিত আছে বিরাট অবয়বের এক বৌদ্ধ মূর্তি। এই মন্দিরেরই দরজা শীর্ষে লিখিত আছে রাণী কালিন্দির সেই ঐতিহাসিক ভাষ্য, যা চাকমা ইতিহাসের মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ। এটা চাকমা সমাজের বাংলা ভাষা ও রচনা শৈলী ব্যবহারের অন্যতম প্রাথমিক নিদর্শন ও বটে। এই লিপিটি শিলালিপি নয়, দেওয়াল লিপি বলাই সঙ্গত। কারণ এটি আস্তরের উপর খোদাই করা, শীলের উপর নয়। লেখাটি হুবহু

এখানে উদৃত হলো :

গ) 'শ্রী শ্রী ভোক্ত ফড়া

বিজ্ঞাপণ

'সর্ব সাধারণের অবগতার্থে এ বিজ্ঞাপণ প্রচার করিতেছি যে, অত্র চট্টগ্রামস্থ পর্বতাধিপতি আদী রাজা শের মস্ত খাঁ, তৎপর রাজা শুকদের রায়, অতঃপর রাজা সের দৌলত খাঁ, পরে রাজা জান বকশ খাঁ, অপরে রাজা তব্বার খাঁ, অনন্তর রাজা জব্বার খাঁ, আর্য্য পুত্র রাজা ধরম বকশ খাঁ, তৎসহধর্মিণী আমি শ্রীমতি কালিন্দি রাণী আপন অদৃষ্ট সাধনাভিলাষে তাহানদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাত নমস্কার প্রদান করিলাম। মদীয় পূর্ববর্তীর ধর্মার্থে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য দ্বিগদেশীয়

অনেকানেক ফুঙ্গিগণ কর্তৃক শাস্ত্রানুসারে ১২৭৬ বাঙ্গালার ৮ই চৈত্র দিবসে অত্র রাজানগর মোকামে, সুমঙ্গলা রত্নাকর চিঙ্গ সংস্থাপন হইয়াছে। তাহাতে আজন্মাবধি বিনা করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঠাকুর হইতে পারিবেক। উল্লেখিত পুণ্যক্ষেত্রের দক্ষিণাংশে শ্রী শ্রী চাক্য মুনি স্থাপিত হইয়া তদুপলক্ষে প্রত্যেক সনাখেরিতে মহাবিষুর সময় যে সমারোহ হইয়া থাকে ঐ সমারোহেতে ক্রয়-বিক্রয় করণার্থে যে সমস্ত দোকান ও বেপারী আগমন করে ও মঙ্গলময় মুনি দর্শনে যে সমস্ত যাত্রিক উপনীত হয়, তারা দিগ হইতে কোনেক প্রকারের মাসুল অর্থাৎ কর গ্রহণ করা যাইবে না। ইদানিক কি ভবিষ্যতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ হইতে ইহা লঙ্গণ করিয়া কর গ্রহণ করি ও করাই কি করে বা করায় তবে এই জন্মে ঐ জন্মে এবং জন্মে জন্মে মহাপাতকি পাত্রে পরিগণিত হইবে।'

'কিমাধিক মিতি' ঃ (শ্রীমতি কালিন্দি রাণী)

এই চিঙ্গ স্থাপনের ১২ বছর আগে ১৮৫৭ খ্রীঃ সালে ব্রহ্ম দেশাগত সঙ্ঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির ও হারবাং-এর গুণামেজু ভিক্ষুর কাছে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে রাণী কালিন্দি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হোন। (সুত্র : চাকমা জাতি পৃ: ১১২ এবং বাবু সুগত চাকমা লিখিত প্রবন্ধ : চাকমা বর্ণমালার ইতিবৃত্তঃ উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুন ১৯৮২ ইং রাঙ্গামাটি) তবে অন্য তথ্যে ব্রহ্মদেশীয় ঐ মহাস্থবিরের এদেশের আগমনকাল পরবর্তী ষাটের দশকে বলে বর্ণিত হয়েছে, যদ্দরুণ রাণীর ধর্মান্তর গ্রহণের সময় ও গুরু গ্রহণের তারিখেও ভিন্নতা ঘটা সম্ভব।

এখানে স্মর্তব্য যে, রাজা ধরম বখ্শ খাঁ ও তার পিতা জব্বার খাঁর সীলমোহরে দেবী কালি তারাও নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাতে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশিত হয়। রাজা ভুবন মোহনের স্মৃতি কথায় রাণী কালিন্দির হিন্দু ধর্মানুরাগ স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আগে রাণী কালিন্দির পক্ষে স্বামী ও শ্বশুরের ধর্মানুসারী থাকাই সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে স্বামী ও শ্বশুরের মুসলিম নাম ও খেতাব ধারণ এবং খোদ রাণী কালিন্দি কর্তৃক বিবি উপাধি ব্যবহার, মসজিদ স্থাপন ও ইসলাম ধর্মীয় সেবা অনুসরণ, সঙ্গতি বিহীন কাজ। মনে হয় তাদের সবাই সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মিশ্র ধর্মাচারের ঐ ঐতিহ্যকে শেষ বয়সে রাণী পরিত্যাগ করে নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধে পরিণত হোন। তাঁর ঐ বৌদ্ধানুরাগকে অনুসরণ করে চাকমা সমাজ ও তখন থেকে বৌদ্ধে পরিণত হয়েছেন কিনা তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

দীঘির পশ্চিম প্রাঙ্গণের মন্দিরের পরবর্তী দক্ষিণাংশ খালি সমতল। এখানে কোন ইমারতাদির চিহ্ন নেই। কথিত মসজিদটির এই এলাকায় থাকা ও সন্দেহজনক। কারণ এক পরিবেশে মন্দির ও মসজিদের অবস্থান পূজা আর এবাদতের ভিন্নতার গুণেই অপ্রত্যাশিত। বিশেষতঃ মুসলিম প্রধান এই অঞ্চলটিতে মসজিদের পাশে মন্দির এবং নামাজের পাশে পূজা অর্চনা সহনীয় হতে পারে না। সুতরাং কথিত মসজিদটির পূর্বের দীঘির পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মান্য। দ্বিতীয় দীঘিটি হয়তো পরে

খননকৃত। তবে এ ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান আবশ্যক।

এতদাঞ্চলের সর্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি এবং রাজবাড়ীর সামনের স্কুলটির প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বাবু ব্রজেন্দ্র লাল পালকে জিজ্ঞাস করে জানা গেলো যে, পূর্বের দীঘির পাড়ের মসজিদটি আসলে গোলাম মেহদির মসজিদ নামে খ্যাত। আগে তা মাটির দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সম্প্রতি পাকা হয়েছে। এই মসজিদটিকেই রাজাদের মসজিদ বলে। গোলাম মেহদি হয়তো রাজ পরিবারের গুরু বা কোন সদস্য ছিলেন।

অতঃপর আমরা পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত রাজমহলের অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হই। দীঘিটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় প্রথমেই একটি লম্বা ইটের গাঁথুনী ও টিনের ছানিযুক্ত ঘর অবস্থিত। এটা কাছারী ঘর নামে খ্যাত, যা বর্তমানে একটি করাত কলে পরিণত হয়েছে। ঘরটির পিছনের দক্ষিণ-পশ্চিমে সোজা পশ্চিমমুখী পথের দু'পাশে ও সামনে আন্দর মহলের বিস্তীর্ণ এলাকা। দীঘির সোজা পশ্চিমে-উত্তর অংশে কিছু ব্যবধানে একটি ছোট মহলী-পুকুর আছে। ঠিক মাঝামাঝি এলাকায় বাঁশ গাছ ও টিনের ছানিযুক্ত পুরাতন জীর্ণ, কিন্তু বেশ বড় একটি আবাসগৃহ অবস্থিত, যে ঘরটির বাসিন্দা হলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতৃপক্ষের জনৈক বংশধর। ঘরটির মালিক অনুপস্থিত থাকায়, তার কাছে দ্রষ্টব্য পুরাতন কোন নির্দশনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো না। এই ঘরেরই দক্ষিণ অংশে রাজবাড়ীর মূল ইমারতটি পরিত্যক্ত আর আধা বিধ্বস্ত অবস্থায় দন্ডায়মান।

দালানটি ইটের দ্বারা প্রস্তুত দ্বিতল ও প্রাসাদোপম। পশ্চিম অংশের ছাদ ও দ্বিতল অংশ আংশিক ধ্বসে গেছে। নীচের দেওয়ালগুলো অক্ষত আছে। দালানটির উপরে ও নীচে ছোট-বড় গাছ লতা-পাতা ও জঙ্গলে ঢাকা, যা সাপ বিচ্ছুর নিরাপদ আশ্রয় হওয়ার যোগ্য। ভয়ে ভিতরে যাওয়া ও পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না। নিরাপদ দূর থেকে বাঁশ গাছ ও লতা পাতার ফাঁক দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হলাম।

ধ্বংসাবশেষ হলেও এটি বিরাটত্বে ও বাহ্যিক অবয়বে প্রাসাদেরই পরিচয় বহন করে। অযত্নে অবহেলায় দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকার কারণে, বাড়ীটি দীন হীন বিধ্বস্ত। এভাবে থাকলে অচিরেই এটি পরিপুর্ণ ধ্বংসস্তূপের রূপ নিবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দালানটিতে মোগলাই নির্মাণ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। ইটগুলো চুন সুরকিতে গাঁথা, দেয়াল ও দরজা জানালায় গোল খিলান পদ্ধতি অবলম্বিত। জঙ্গলে আবৃত থাকার কারণে ছাদের গঠন প্রণালী অবলোকন করা গেলো না। সাধারণ অবয়ব আর অবস্থিতির দ্বারা মনে হলো, রাজ বাড়ীটি পশ্চিমমুখী, যার সামনে ইছামতি নদী প্রবাহিত। নদীর পাড় ধরে পূর্বমুখী সংযোগ পথ, দীঘির পাড়ের মূল সড়কটির সাথে যুক্ত হয়েছে।

এই রাজ মহলটি তার বিশাল ও জৌলুশময় অবয়ব, বিস্তৃত পার্শ্ব পরিবেশ, আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের নির্দশনাদিসহ অতীত গৌরবের সমৃদ্ধ স্মৃতি বহন করে। এর মালিকদের উঁচু সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য, বিশাল সম্পদ সম্পত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী থাকা এতদ্বারা নিশ্চিত হয়।

দালানটিতে ব্যবহৃত ইটগুলো হাল আমলের মত চওড়া ও বড় হওয়ায় এর নির্মাণকাল বৃটিশ আমল বলেই নির্ণীত হয়। মোগল আমলের ইট ছিলো পাতলা ও ছোট। নির্মাণ কৌশলে খিলান পদ্ধতি আর চুন-সুরকি ব্যবহৃত হওয়ায় অনুমিত হয় মোগল আমলের কাছাকাছি সময়কালেই এটি নির্মিত। ইতিহাস আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, চাকমা প্রধান শের দৌলৎ খাঁ ১৭৭৬ খ্রীঃ সালে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর ঐ বিদ্রোহে কিছু বাঙ্গালী আর কুকি লোকজন শরিক ছিলো। রাজা জান বখশ খাঁও পিতার সূচিত ঐ বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু জনগণের দুঃখ দুর্দশায় মুষড়ে পড়ে ১৭৮৭ খ্রীঃ সালে আত্মসর্পণ করেন। তৎপর সরকারী চাপে তিনি রাজভিলা পাহাড়ের পরিবর্তে রাঙ্গুনিয়ার এই অঞ্চলকেই বাসস্থান হিসাবে বেছে নেন। আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে রাজবাড়ি এবং রাজাদের নামে চিহ্নিত বিভিন্ন হাট-বাজার ও জনপদ। সে থেকেই রাজার হাট, রাজানগর, রাণীর হাট ও রাজাদের বিনোদন কেন্দ্র ফুল বাগিচা ইত্যাদির নামকরণ ও পরিচিতির উদ্ভব।

আমার মনে হয় রাজাদের রাঙ্গামাটি স্থানান্তর গ্রহণের পক্ষে যেমন সরকারী চাপ কার্যকর ছিলো, তেমনি তাদের রাঙ্গুনিয়ার বসবাসটিও ছিলো বৃটিশ আরোপিত বাধ্যবাধকতার ফল। রাজাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখাই ছিলো সরকারের উদ্দেশ্য। এ কারণেই কোদালারম উজানে শিলক উপত্যকায় অবস্থিত শুকবিলাস ও রাজভিলার পুরাতন রাজাবাড়ি ও কাছারীগুলো পরিত্যক্ত হয়, যে অঞ্চলটি এখনো চাকমা রাজ পুরুষদের স্মৃতিতে ধন্য।

বিদ্যুৎ উন্নয়নের প্রয়োজনে রাঙ্গামাটির তৃতীয় রাজাবাড়িটিও এখন কর্ণফুলী হ্রদের গভীর জলে বিলীন হয়ে গেছে। চতুর্থ রাজাবাড়িটি রাঙ্গামাটির একাংশে পুনর্নির্মিতি হলেও, সেই রাজকীয় শান শওকত আর অর্থাগম এখন অব্যাহত নেই। জুমিয়া প্রজা আর জুম কৃষির অভাবে এখন আর এই রাজবাড়িতে লোক সমাবেশ ও পুন্যাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। দরবার ও বসে না। এখন রাজবাড়ীগুলোর সবটাই মৃতপুরী এবং তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষমতাহীন।

এখন চাকমা সমাজে রাজারা অবহেলিত। তবে এটা ভেবে দেখার অবকাশ আছে যে, এই রাজাদের গুণেই চাকমা সমাজের স্বতন্ত্র পরিচিতি ও মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতীত থেকে দলপতি নিয়ন্ত্রিত আর ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণেই তারা বিশেষ সমাজ ও সম্প্রদায় হিসাবে মান্য। তাদের বিশেষ উপজাতীয় পরিচিতি ও প্রভাবের ভিত্তি হলো দীর্ঘ রাজকীয় ঐতিহ্য। সর্দারী নিয়ন্ত্রণই তাদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি।

নতুবা পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীর মত তাদেরও বিলীন হয়ে যাওয়া ছিলো অবধারিত। এতদাঞ্চলে মোগল, পাঠান, তুর্কি, ইরানী ও হাবসীদের প্রভাব ও সংখ্যা কম ছিলো না। কিন্তু রাজনৈতিক ও সমাজগত ঐক্য, শক্তি ও প্রভাবের অভাবে তারা আজ পরিচয়হীন বিলীন। স্বধর্মীয় বৃহৎ সমাজ ও সম্প্রদায়গুলো তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। চাকমা সমাজকে অনুরূপ হারিয়ে যাওয়া থেকে তাদের রাজনেতৃত্বই বাঁচিয়েছে। এখন শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুণে নেতৃত্বের বিস্তার ঘটেছে। গণতান্ত্রিক ক্ষমতাবাদ ও আধুনিক জীবনধারায় উপজাতিরাও উদ্বুদ্ধ। কায়েমী ও খান্দানী নেতৃত্ব এখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত, স্বচ্ছল, ক্ষমতালিপ্সুদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই নেতৃত্ব এখন আর অভিজাত বংশানুসারী ও নির্বিরোধ নেই। শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থ এখন আর রাজবাড়ীতে সীমাবদ্ধ নেই। প্রজাদের অনেকেই এখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং রাজনেতৃত্ব এখন অতীতের ঐতিহ্যই মাত্র। রাজ বংশধরেরা এখন অতীতের সুখকর ও গৌরবময় স্মৃতি রোমন্থনেই সান্ত্বনা পেতে বাধ্য। উচ্চ শিক্ষা গণতন্ত্র ও আধুনিকতা উপজাতিদেরকেও উচ্চাভিলাষীতে পরিণত করেছে। তাদের কাছে এখন রাজঐতিহ্য মানে পশ্চাদপদতা ও আদিমতা। রাজ আধিপত্যকে মর্যাদাপূর্ণ অতীত ঐতিহ্য বলে মানা হলেও এখন তা অবহেলিত। সবারই চিন্তা-চেতনা ভোগ-বিলাস ও নেতৃত্ব প্রয়াসী। বাস্তব সুখ সুবিধা ও স্বার্থই ব্যক্তি চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এখন উপজাতীয়তার দাবী রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের সূত্র মাত্র। এ কারণেই প্রকৃত ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। অবশ্যই এই অতিরঞ্জন সর্বপ্রথম রাজ পরিবার থেকেই শুরু হয়েছে। রাজা ভুবন মোহন রায় দীর্ঘ কৌলিন্য রচনার প্রয়াস হিসাবে কিছু আজগুবী কথা কাহিনী চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেন। তাতে রং চড়িয়ে আরো ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলের বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান, বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা, ও অন্যান্য অনেকে। এই প্রয়াসেরই শেষ চেষ্টা হিসাবে বাবু সুগত চাকমা তার বিভিন্ন পুস্তক ও রচনায় চাকমা অতীতকে স্বাধীন রাজ্যাধিকারে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা তাদের প্রামাণ্য অতীত তথ্য নিদর্শনাদি কোন মতেই সমর্থন করে না। এতদসত্ত্বেও চাকমা রাজকৌলিন্য ও তাদের উচ্চ শিক্ষা অস্বীকারযোগ্য নয়।

রাজানগর রাজবাড়ীর অবস্থান, মুসলিম প্রধান এলাকায় নির্ণীত হওয়াকে কার্যকারণহীন বলা যায় না। তদুপরী চট্টগ্রাম সদর ও পর্বতাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলকে ত্যাগ করে, ঐ নদীর উত্তর তীরের অন্যতম উপনদী ইছামতির ৩/৪ মাইল অভ্যন্তরের রাজানগর অঞ্চলকে রাজবাড়ীর জন্য বেছে নেওয়াটাও কার্যকারণহীন নয়। যদি আশ-পাশের টিলাময় আধা পাহাড়ী অঞ্চলে জুম চাষের সুবিধাকে কারণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়, তাহলেও বলা যায়, এর চেয়ে ভাল জুম ভূমি অন্যত্র পাওয়া সম্ভব ছিলো।কোদালার পাশাপাশি শিলক কর্ণফুলীরই অন্যতম দক্ষিণ-পূর্বমুখী উপনদী, যার কয়েক মাইল

ভিতরে অবস্থিত উপত্যকায়, রাজভিলা ও শুক বিলাস নামীয় জায়গায় রাজবাড়ী ও রাজ দপ্তর বিদ্যমান ছিলো। অবস্থানগত ভাবে শিলক উপত্যকা আর ইছামতি উপত্যকা কর্ণফুলীর দুই বিপরীত তীরে পাশাপাশি অবস্থিত। দূরত্বের বিচারেও দুই রাজবাড়ী অঞ্চল ৯/১০ মাইলের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত নয়। তবে ইছামতি অঞ্চলটি সুলতানী আমল থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত। ঈসা খাঁ মসনদে আলা ও তাঁর সহযোগীরা মোগলদের দ্বারা পশ্চাত-ধাবিত হয়ে সৈন্যসামন্ত সহ উক্ত এলাকায় বহুবার আত্মগোপন করেছিলেন এবং তা ছিলো তাদের শক্তি সঞ্চয়ের বিশ্রামস্থল। তাদের সেই অবস্থানের স্মৃতি ধারণ করেই ইছামতি, ঈসাখালী ইত্যাদি নাম প্রচলিত। পরে মোগল আমলেও এতদাঞ্চল মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাজার হাটের নিকটকার মোগলের হাট তার স্মৃতিবাহী স্থান। সম্ভবতঃ পাঠান ও মোগল বংশীয় কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন, যাদের সাথে চাকমা রাজ পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো। বাসস্থান নির্বাচনে সেই আত্মীয়দের নৈকট্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় মুসলিম সম্ভ্রান্তদের সাথে চাকমা রাজপরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কথা এই লেখকের নিজস্ব অনুমান মাত্র নয়, এটা বিভিন্নভাবে একাধিক নির্ভরযোগ্য সুত্রের দ্বারা সমর্থিত। যথা :

১) রাজা ভুবন মোহন রায়, নিজ পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে স্বীয় উর্ধ্বপুরুষদের যে তালিকা প্রদান করেছেন, সে তালিকায় দেখা যায়, তার অনেক উর্ধ্ব পুরুষ খাঁটি মুসলিম নাম ও খেতাবের অধিকারী, যে তালিকার অন্যতম নাম হলো মোগল্যা, যা মোগল নামের স্থানীয় বিকৃতি। একাধিক সুত্রে স্বীকার করা হয়, তার মা ছিলেন সুজা দুহিতা বা অন্য একজন মোগল কন্যা।

২) একাধিক সুত্রে এটা সমর্থিত হয়েছে যে, অতীতে চাকমা মহিলাদের কাফন পরিয়ে কবর দেয়া হতো। তাদের বিবাহে মোহরানা সাব্যস্ত হতো, যা চাকমা ভাষায় এখন দাবা নামে খ্যাত, এবং সম্ভ্রান্ত চাকমা মহিলারা বিবি সম্বোধিত হতেন ও পর্দা মান্যতায় অভ্যস্ত ছিলেন। এ কারণেই চাকমা ভাষায় ছদর শব্দটি প্রচলিত, যা ইসলামী পরিভাষা 'ছতর' এর অপভ্রংশ, যার অর্থ লজ্জাস্থান। এ থেকে ছতর ঢাকা বা পর্দা করা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৩। চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ ও তার পুত্র জান বখশ খাঁর বিদ্রোহী তৎপরতার সদদগার হিসেবে জনৈক মুন গাজী ও তার কিছু মুসলিম সহযোগীদের কথা বিভিন্ন সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। ঐ লোকগুলো বিদ্রোহী চাকমা রাজ পক্ষের মিত্র তো বটেই, তাদের আত্মীয় হওয়ার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বার্থ ছাড়া তাদের পক্ষে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের দুঃসাহস করা সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। সরকারের উপর তাদের অসন্তুষ্ট হবার অন্য কোন কারণও কোন বিবরণে ব্যক্ত হয়নি। এই সহযোগিতাকে কার্যকারণ হীন

বা দুষ্কর্ম বলার পক্ষেও কোন যুক্তি নেই। সুতরাং মুনগাজীদের ঐ মদদকে ঘনিষ্ট আত্মীয়দের প্রতি, বিপদক্ষণের সহায়তা ভাবা যেতে পারে।

৪) চাকমা সর্দারদের দরবারী আচার-আচরণ ও আড়ম্বর মোগলদের হুবহু অনুকরণ বলা যায়। পাগড়ী, শেরওয়ানী, পায়জামা, নাগারা জুতা আর তলোয়ার শোভিত চাকমা রাজপুরুষেরা যখন দরবারে পদার্পণ করেন, তখন সমবেত প্রজা সাধারণ হুজুরের উদ্দেশ্যে কুর্ণিশ ও নজরানা আরজ করে থাকেন এবং অন্দরমহলেও রাজ মহিষী বিবি মর্যাদায় সালাম পান। দরবারটিও সানাই সুহরত সহকারে বসে ও ভাঙ্গে। এটা মোগলাই দরবারেরই মহড়া। সুতরাং ভাবা সঙ্গত যে, মোগলাই আত্মীয়তার সুত্রেই উক্ত অনুষ্ঠানাদি চাকমা রাজমহলে সংক্রমিত।

৫) চাকমা ভাষাটি ও চট্টগ্রামী মুসলিম সামাজিক ভাষার জমজ। এতে আরবী ফার্সি ও ইসলামী পারিভাষিক শব্দ সংখ্যায় প্রচুর। খোদ মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এটা রপ্ত করা সম্ভব নয়। বিস্ময়করভাবে ভাষাটি পৌত্তলিকতা মুক্ত। তাদের অভিধানে ঈশ্বর শব্দ নেই, বরং দুঃখ ও ক্ষোভে সৃষ্টিকর্তাকে খোদা বলেই তাদের স্মরণ করতে দেখা যায়।

৬) রাজা শের জব্বার খাঁর সীলমোহরে 'আল্লাহু রাব্বি' খোদাই করা থাকায় ঐ বাক্যটির দ্বারা তাদের তখনকার পারিবারিক ধর্ম ইসলাম বলেই নির্ণীত হয়। রাজানগর রাজাবাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান এবং মসজিদটিও তাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার স্মারক।

৭) মসজিদ প্রাঙ্গণের মাজারে সম্ভবতঃ কোন মুসলমান চাকমা রাজপুরুষই সমাহিত আছেন।

(ঘ) রাজভিলা ও শুকবিলাস পরিদর্শন

এতদাঞ্চলীয়, চাকমা ইতিহাসের সাথে শিলক নদী উপত্যকার পদুয়া অঞ্চলটি জড়িত। কর্ণফুলী নদীর পূর্বাগত প্রথম উল্লেখযোগ্য উপনদী হলো শিলক। এটি দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়াকে ভেদ করে কর্ণফুলীতে পতিত। তার উৎসস্থল হলো পূর্ব সীমান্তের পাহাড় শ্রেণী। ঝংকা এর অন্যতম খাল বা উপনদী। মোহনার কয়েক মাইল ভিতরের উপত্যকা অঞ্চলটির নাম পদুয়া বা মাওদা। এখনকার মত অতীতেও বাঙ্গালী অধ্যুষিত আধা পাহাড়ী এই এলাকাটি পদুয়া বা মাওদা নামেই অভিহিত হতো। চট্টগ্রামের শেষ মোগল শাসক জুলকদর খান, এতদাঞ্চলীয় প্রথম চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁকে কিছু অনাবাদী পাহাড় বন্দোবস্তি দান করেন। ঐ বন্দোবস্তিতে মাওদা নামের উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, এলাকাটি এ নামীয় একটি প্রাচীন আবাদী অঞ্চলই ছিলো। এই শিলকেরই অন্যতম ছড়া হলো বাঙ্গাল হাল্যা। নামটি অর্থপূর্ণ ও বিকৃত। আসলে এটি ছিলো বাঙ্গাল খাল বা খালি। তা থেকে বিকৃতির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে বাঙ্গাল হ্যাল্যায় ও বর্তমানে মঘী উচ্চারণে তা বাঙ্গাহ্লা।

এই নামটাই প্রমাণঃ এতদাঞ্চল হলো বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রাচীন আবাদী এলাকা। স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ চাকমারা বাঙ্গালীদের সম্বোধন করে বাঙ্গাল নামে। হয়তো শের মস্ত খাঁর অনুসারী চাকমারাই এলাকাটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত বলে, এ নামটি প্রয়োগ করেছে এবং এলাকাটি অদ্যাবধি তাতেই পরিচিত হয়ে আছে।

শের মস্ত খাঁ চাকমা সমাজে এতদাঞ্চলীয় আদি রাজা নামে খ্যাত। চাকমা লোকগীতিতে তার এই নামটি স্বীকৃত, যথাঃ

'আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ি, তারপর শুকদেব রায় বান্ধে জমিদারী।'

চাকমা রাণী কালিন্দি, রাজা নগর বৌদ্ধ মন্দির গাত্রে লিখিত আকারেও স্বীকার করেছেন ঃ শের মস্ত খাঁই, এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের আদি রাজা।

অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, স্বীয় গবেষণা পত্রঃ রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুলকদর খানের দ্বারা চাকমা সর্দার শের মস্ত খাঁ ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে মাওদায় পুনর্বাসিত হোন।

বর্ণিত এই তিন সুত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এতদাঞ্চলে শের মস্ত খাঁ ও কিছু চাকমার প্রথম আগমন ও বসবাসকাল হলো ঐ ১৭৩৭ সালই। তৎপূর্বে তাদের বাসস্থান ছিলো আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চল এবং তখনো চাকমাদের প্রধান বা মূল অংশ, বাংলাদেশে স্থানান্তর গ্রহণ করে নি। পরবর্তী চাকমা সর্দার শের জব্বার খাঁর ব্যবহৃত সীলমোহরের ভাষাই প্রমাণ যে, তার জীবনকালের শেষ পর্যন্ত মূল চাকমা জনগোষ্ঠী ও তাদের আনুষ্ঠানিক সর্দারের সদর দপ্তর আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চলেই অবস্থিত ছিলো। আরবী বর্ণ ও ভাষায় খুদিত ঐ সীলমোহরের ভাষ্যটি হলো ঃ রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান, ১১১১। মঘী সন হিসাবে এ সংখ্যাটিকে ১৭৪৯ খ্রীঃ ধরে, বলা যায় এটি তার সর্দারীর শুরু কাল। পরবর্তী সর্দার নুরুল্লাহ খাঁর সীলমোহর সুত্রে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শের জব্বার খাঁর মৃত্যু কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ। বস্তুতঃ স্থানীয় ইতিহাস সুত্রটিও বলে ঃ শের জব্বার খানই নিঃসন্তান শের মস্ত খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৮ খ্রীঃ সালে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হোন। এ থেকে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায়, মোগল আমলের শেষ ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের শুরু কালেই এতদাঞ্চলে ব্যাপকহারে চাকমা আগমন ঘটনার শুরু, যাদের সঙ্গী ছিলেন খোদ সর্দার শের জব্বার খান। পরবর্তী ১৭৮৪/৮৫ সালে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান দখল ও জনসাধারণের উপর ব্যাপক উৎপীড়ন, তথাকার দেশ ত্যাগীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। যাদের ভিতর চাকমা, মগ, লুসাই, মুরুং ইত্যাদি শরণার্থী ছিলো। ১৮১৮ সালেও এতদাঞ্চলে একদল অঞ্চঙ্গ্যার আগমন ও আশ্রয় লাভ ঘটে। এই শরণার্থী সমস্যারই পরিণতি হলো ১৮২৪ সালে অনুষ্ঠিত বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধ, এবং ভারতের অন্যতম প্রদেশ রূপে আরাকানের অন্তর্ভুক্তি। সুতরাং চাকমা মগ মুরং ইত্যাদি। অবাঙ্গালীরা এতদাঞ্চলের আদিবাসীন্দা নয়, বৃটিশ আমলে গ্রহণকৃত

বহিরাগত অভিবাসী।

শের মস্ত খাঁর এ দেশীয় আবাসভূমি পদুয়া বা মাওদা ও তার আশপাশকে সরে জমিনে দেখা ও সে আমলের স্মৃতি সন্ধানের উদ্দেশ্যে আমি গত ১১ই অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় সফরে যাই।

চন্দ্রঘোনার রায়খালি বাজার থেকে সঙ্গী হলেন, আমার এক শুভাকাঙ্খী ও আপনজন জনাব আব্দুলগনি এবং মতিপাড়া থেকে পুত্র প্রতিম কালামং। তারা মাওদা পদুয়া ও তার আশপাশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। পথে দেখা হয়ে গেলো পদুয়ারই এক সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা মৌলভী আবুল হোসেনের সাথে। তিনি তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন ঃ এ অঞ্চলে অশীতিপর বৃদ্ধ ডাক্তার জনাব আং জব্বার যিনি তার শ্রদ্ধেয় পিতা, এতদাঞ্চলের অতীত স্মৃতির সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই অপ্রত্যাশিত সংযোগে আমি আনন্দিত হলাম। বাঙ্গালহাল্যা থেকে হাটা পথে, টিলা ছড়া জমি, চড়াই উৎরাই, দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে পৌঁছলাম শুক বিলাস পাড়া নামে খ্যাত ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে। দেখা হলো তার সাথে। শুনলাম অনেক কথা কাহিনী।

তিনি বললেন শের মস্ত খাঁর পোষ্যপুত্র হলেন ঃ শুকদেব রায় । আগে বর্ণিত চাকমা লোকগীতিতে তিনি তা-ই উল্লেখিত হয়েছেন। পূরাণ কথা কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায়ঃ শের মস্ত খাঁকে প্রদত্ত বন্দোবস্তিটির নাম ছিলো তরফে শুকদেব রায়। তার একটি সীলমোহর আছে। তদনুযায়ী তিনি রাজা নন, জমিদার। লোকগীতিটি ও তার জমিদার হওয়ার সমর্থক। ঐ সীলমোহরের সময়কাল হলো ১১১৫। মঘী পঞ্জিকা ধরে তার সময়কাল দাঁড়ায় ১৭৫৩ খ্রীঃ সাল। অধ্যাপক আলমগীরের প্রদত্ত তথ্য মতে তিনি স্বীয় পালক পিতার জীবদ্দশায় ১৭৫৮ খ্রীঃ সালে আগে মারা গেছেন। ঐ শুকদেব রায়েরই স্মৃতিবাহী এই শুক্ক বিলাস। জব্বার সাহেব জানালেন, এখান থেকে মাইল দেড়েক পশ্চিমে অবস্থিত রাজারহাট ও তার পার্শ্ববর্তী সেগুন বাগিচাটি, চাকমা রাজাদের স্মৃতিবাহী রাজবাড়ী বা কাছারী এলাকা। এখন প্রাচীন কোন ইমারতের চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। তবে প্রাচীন ধনলোভী কেউ কেউ কখনো সখনো এসে ঐ এলাকায় খোড়াখুড়ি করে। তাতে প্রাচীন কালের ইট সুরকি দৃষ্ট হয়। এছাড়া সে কালের স্মৃতি হিসাবে একটি মজা পুকুর বর্ণীত সেগুন বাগিচাটির দক্ষিণ পাশে এখনো টিকে আছে। শিলক নদীটি তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত। এছাড়া কোন স্মৃতি চিহ্ন দ্রষ্টব্য নয়। হেটে হেটে এলাকাটি দেখে নিলাম।

এখানে কোন অবাঙ্গালীর বসবাস নেই।

এই এলাকাটি রাণী কালিন্দি রোড নামীয় একটি কাঁচা সড়কের দ্বারা পূর্বের রাজভিলা ও পশ্চিমের শিলক মুখের সাথে সংযুক্ত। উভয় স্থানের দূরত্ব সম্ভবতঃ ১০/১৫ মাইল। মাঝামাঝি রাজার হাটের অবস্থান।

নামের সাদৃশ্যে মনে হয় আরো ১০/১৫ মাইল দূরবর্তী পুর্বের রাজস্থলী পর্যন্ত

রাজাদের সম্পত্তির বিস্তৃতি ছিলো, অথবা সে পর্যন্ত চাকমা বসতি গড়ে উঠেছিলো।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অতিরিক্ত শের মস্ত খাঁকে পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুম কর আদায়ের তহলিদারী' দেয়া হয়েছিলো। তাতে কুকি ইত্যাদি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সীলমোহর অনুযায়ী দেখা যায়, ১৭৪০ খ্রীঃ সালে চাকমা সর্দার হলেন সোনা বি নামীয় জনৈকা মহিলা। তৎপরবর্তী সর্দার শের জব্বার খান ১৭৪৯ খ্রীঃ তৎপর নুরুল্লাহ খান ১৮৬৫ খ্রীঃ অতঃপর ফতেহ খান ১৭৭১ খ্রীঃ এবং তারপর শের দৌলৎ খান ১৭৭৩ খ্রীঃ সাল। এই শের দৌলৎ খান ও তদীয় জামাতা রনু খানই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং তাদের সহযোগী হোন মুন গাজী ও তার দল, এবং তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জুমজীবী কুকিরা।

আমার বর্ণনায় মুন গাজির কথা শুনে উৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন ডাক্তার সাহেব ও তার ছেলে। বললেন ঃ আমরাই সেই গাজিদের আওলাদ। তাদের হাতে ঐ প্রাচীন আমলের দলিল আছে। যে দলিলটি ঐ প্রাচীন ইতিহাসের পুষ্টি যোগায়।

বৃটিশরা স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। এ কারণে মুন গাজিরা তাদের দ্বারা ডাকাত রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাকামী জঙ্গীরা আখ্যায়িত হয়েছেন বিদ্রোহী রূপে।

শের দৌলৎ খাঁ, রনু খাঁ ও মুন গাজিদের ঐ বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র কার্যক্রম ছিলো সারা পূর্বভারত ব্যাপ্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ। তখন সারা বাংলা ও বিহার জুড়ে পরিচালিত ফকির ও সন্যাসীদের বৃটিশ খেদাও যুদ্ধ, স্বতন্ত্র কিছু ছিলো না। তখন ঐ ত্রয়ী যোদ্ধাচক্র নিজস্ব কোন স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণাও দেননি। বরং শের দৌলৎ খাঁর পুত্র, অন্যতম স্বাধীনতা যোদ্ধা ও পরবর্তী চাকমা সর্দার জান বখশ খান, নিজেকে মহারাজ বা জমিদার ঘোষণা করে, সীলমোহর ব্যবহার করেছেন। এই জান বখশ খাঁই ১৭৮৬/৮৭ সালে ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে, নিজ জমিদারী ও মর্যাদা রক্ষায় আপোষ রফা করেন। কিন্তু জমিদারী ও অভিজাত মর্যাদা রক্ষা পেলেও, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাকে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে স্থানান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন। কারণ পদুয়া বা মাওদা হলো পূর্বের অরাজক পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশ, যেখান থেকে বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজ।

১৭৩৭ থেকে ৮৭ এই পঞ্চাশ বছরকালের চাকমা সদর দপ্তর হলো পদুয়াস্থিত শুক বিলাস অথবা রাজ ভিলা। সম্ভবতঃ শুক বিলাস ছিলো জমিদারী সংক্রান্ত কাছারী বাড়ী, এবং রাজভিলা রাজাদের আবাসস্থল। রাণী কালিন্দি সড়কের মাঝামাঝি শুক বিলাস, আর শেষ পূর্ব প্রান্তে ঝংকা খালের পারে রাজভিলা।

সদর দপ্তর ও রাজবাড়ী ৬ত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে স্থানান্তরিত হলেও, উভয়ের দূরত্ব ১৫/২০ মাইলের বেশী নয়। শিলক নদীর বিপরীতে কর্ণফুলীর উত্তরমুখী উপনদী ইসামতি পারের, মাত্র ৪/৫ মাইল ভিতরে রাজানগর অবস্থিত।

পদুয়ার সড়কটি রাণী কালিন্দির স্মৃতি স্মারক। তিনি জান বখশ খাঁর নাতি ধরম বখশ খাঁর পত্নি ও সাধারণ ঘরের মেয়ে। তবে অরাজবংশীয় মহিলা হলেও তিনি চাকমা সমাজে বিপুলভাবে কীর্তিত। এই সড়ক নির্মাণে তার অবদান থাকা সম্ভব।

চাকমা প্রধানদের কোন ভিত্তিতে রাজা বলা হয়ে থাকে, তা পরিষ্কার নয়। আসলে তো তারা এতদাঞ্চলের কোথাও স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ভূপতি ছিলেন না। তাদের ক্ষমতার স্মারকরূপী কয়েকটি প্রাচীন সীলমোহর এ কথাই প্রমাণ করে যে তারা ছিলেন চাকমা নামীয় জনগোষ্ঠীর দলপতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে করদ সামন্ত। স্বাধীন রাজত্ব ও রাজ্যের অধিকারী হলে, মুদ্রা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অধিকারী হতেন। তবে সীলমোহর সুত্রে এ কথা স্বীকার্য যে এই সম্প্রদায় ও তার দলপতিরা অবশ্যই কুলিন এবং অতীতে রোসাং অঞ্চলে তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। তাদের কথিত চম্পক নগর রাজ্য হদিসহীন, যেটি রূপকথার পর্যায় থেকে মুক্ত নয়।

জুলকদর খানের জমি বন্দোবস্তি দান ও জুম কর সংগ্রাহক নিযুক্তি সুত্রে শের মস্ত খান ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা মোগল প্রজা। সম্মান সূচক রাজা ও রায় উপাধি দান তখনকার রেওয়াজ হলেও, চাকমা রাজ পরিবারের এরূপ কোন সনদ থাকা অজ্ঞাত। তাদের রাজা উপাধির পক্ষে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হলো ঃ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা দেশের কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত নন, মূলতঃ তারা সাধারণ জুমিয়া, কুকি ও অন্যান্য অধিবাসী কর্তৃক নিযুক্ত রাজা।' (সূত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীঃ)।

এতদসত্ত্বেও বৃটিশ আমলেই কর্তৃপক্ষীয়ভাবে চাকমা প্রধানদের রাজা সম্বোধন করা হতো, যা কেবল শ্রদ্ধা সূচক উপাধি। তবে চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ প্রশাসক মিঃ হেরি ভেরেলষ্ট ফরমান সুত্রে স্বীকার করেছেন ঃ ফেনী নদী, শঙ্খনদী, নিমাজমপুর সড়ক ও কুকি রাজার পাহাড় পর্যন্ত কার্পাস মহাল ভুক্ত চৌহদ্দির ভিতর রাজা শের মস্ত খাঁর জমিদারী অবস্থিত। (সূত্রঃ চট্টগ্রামের কালেক্টর মিঃ স্মিত কর্তৃক, রাণী কালিন্দিকে লিখিত চিঠি, তাং ২রা জানুয়ারী ১৮৬৬ খ্রীঃ)।

এটাকে রাজ উপাধির পক্ষে কর্তৃপক্ষীয় স্বীকৃতি ভাবা যায়। এখানে এ কথাও পরিষ্কার যে, বৃটিশ আমল বা তার নিকটবর্তী অতীতে এতদাঞ্চলে কোন স্বাধীন চাকমা রাজ্য বা রাজত্ব ছিলো না, এবং কথিত রাজারা ছিলেন, কার্পাস মহাল, তথা জুম নোয়াবাদ ভুক্ত, জুম খাজনা সংগ্রাহক ও সরবরাহকারী কথিত জমিদার বিশেষ। যদিও আসলে কার্পাস মহাল ছিলো সরকারী খাস। সরকারকে খাজনা স্বরূপ নির্দিষ্ট

পরিমাণ তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে বাৎসরিক ইজারা দেয়া হতো। এই বন্দোবস্তির নাম ছিলো জুম নোয়াবাদ। অঙ্গীকার খেলাফীর কারণে চাকমা প্রধানদের নামে প্রদত্ত ঐ ইজারা পরে বাতিল করে কয়েকজন হিন্দু বাঙ্গালীকে তা পর পর দেয়া হয়েছে। ঐ ইজারাদারী ও জমিদারী নয়। কেবল পদুয়া অঞ্চলের বন্দোবস্তিভুক্ত ভূসম্পত্তিকে জমিদারী বলা যায়, যা আসলে ফেনী, শঙ্খ ও লুসাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো না। নাম সুত্রেও বুঝা যায় ঃ ঐ ভূসম্পত্তিটি কেবল রাজস্থলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, যা পদুয়ারই সংযুক্ত পূর্বাঞ্চল। (সূত্র ঃ রাজাজ ওফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস)

শের জব্বার খানের মুসলিম নাম খেতাব ও সীলমোহরে ব্যক্ত আল্লাহ্ রাব্বি বাণী, ঐ চাকমা প্রধানদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়াকেই সমর্থন করে। সাধারণ চাকমা প্রজাদের অনেকেও তখন এরূপ মুসলিম নাম ও খেতাবে পরিচিত ছিলেন। এটা কি তাদের অনেকের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার নিদর্শন? বিষয়টি চিন্তনীয়।

সীলমে,াহর অনুযায়ী শের মস্ত খাঁর পরবর্তী চাকমা প্রধান হলেন জনৈকা সোনা বি, যার কার্যকাল ১৭৪০ সালে শুরু। তৎপরবর্তী চাকমা প্রধান বা সর্দার হলেন শের জব্বার খান, যার কার্যকাল ১৭৪৯ সালে আরম্ভ হয়েছে। এই সীলমোহরটি তিনটি ইসলামী নির্দশন ধারণ করে, যথা ঃ আরবী বর্ন, আল্লাহ্ রাব্বি বাক্য এবং মুসলিম নাম ও খেতাব।

বলা হয়ে থাকে এই মুসলিম ও ইসলামী নিদর্শনগুলো, তখনকার মুসলিম প্রভাবজাত অনুকরণ, যা রোসাং রাজপরিবারেও ব্যবহৃত হয়েছে। শাহের অপভ্রংশ সাঁই শব্দটিও উপাধিরূপে রোসাং রাজপরিবার আত্মস্থ করেন। কিন্তু চাকমা প্রধানদের বেলায় উল্লেখযোগ্য ব্যকিক্রম হলো ঃ রোসাং রাজপরিবারের মত তারা নিজেদের বিকল্প নাম উপাধি পাশাপাশি ব্যবহার করেননি। এই স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করে ঃ চাকমা সর্দার পরিবার আদতেই মুসলিম ছিলেন। এই ইসলামী ধারা ঐতিহ্য, শের মস্ত খাঁর অষ্টম অধস্তন পুরুষ তব্বার খান পর্যন্ত অবিকৃত ছিলো। তৎপর নবম পুরুষ জব্বার খান ও তদীয় পুত্র দশম পুরুষ ধরম বখশ খানে এসে, ঐ ধর্মীয় বিশ্বাস বিকৃত রূপ ধারণ করে। তারা উভয়ে কালিভক্ত ছিলেন, যা তাদের সীলমোহরে বিধৃত আছে। মধ্যবর্তী সর্দাররা হলেন ঃ নুরুল্লাহ খান ১৭৬৫ খ্রীঃ, ফতেহ খান ১৭৭১ খ্রীঃ, শের দৌলৎ খান, ১৭৭৩ খ্রীঃ ও জান বখশ খান ১৭৮৩ খ্রীঃ সাল। ধরম বখশ খাঁ-পত্নি বিধবা কালিন্দি রাণীও নিজে আমৃত্যু সর্দারী বিবি খেতাব ব্যবহার করেছেন। এবং ধরম বখশ খাঁর একমাত্র সন্তান মেনকাও পরিচিত ছিলেন চিকন বিবি নামে।

প্রথমে রাণী কালিন্দি স্বীয় স্বামী ও শ্বশুরের অনুকরণে এক সাথে মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের মিশ্র ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি খাঁটি বৌদ্ধানুরাগীতে পরিণত হোন। তার এই ত্রয়ী ধর্ম বিশ্বাসের নির্দশন রূপে, উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে, নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ, একটি কালি মন্দির ও একটি বৌদ্ধ মন্দির অদ্যাবধি টিকে আছে। তৎপর চিকন বি পুত্র হরিশচন্দ্র,

পরবর্তী সর্দার নির্ণীত হোন, যিনি স্বীয় পিতা গোপিনাথ দেওয়ান সুত্রে অমুসলিম নামের ধারক প্রথম রাজপুরুষ। ১৮৭২ সালে, লুসাই অভিযান কালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তার দ্বারা সহযোগীতা লাভ করেন, এবং তিনি সর্দারীর উত্তরাধিকারী ও হন। এহেতু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাকে পুরষ্কার ও রায় উপাধি দানের দ্বারা সম্মানিত করেন। সে থেকে চাকমা সর্দারীর খেতাবে খান ও বিবির পরিবর্তে রায় উপাধির প্রবর্তন ঘটেছে। অথচ মাতৃ সুত্রে তো বটেই, দাদা থেকে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ পর্যন্ত হরিশ চন্দ্র মুসলিম আভিজাত্য ঐতিহ্যের ধারক যথা ঃ গোপিনাথ, পিতা মল্লাল খাঁ, পিতা চন্দর খাঁ, পিতা বুন্দার খাঁ। এই বুন্দার খাঁ হলেন বিখ্যাত চাকমা নায়ক রনুখাঁর সহোদর ভাই।

চাকমা অভিজাতদের খেতাবী ঐতিহ্য, স্থানীয় মুসলিম অভিজাতদের সমান্তরাল ও অভিন্ন হওয়ায় এই সম্ভাবনাই অধিক যে, তারা পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কিত ছিলেন। তাদের আবাসক্ষেত্র পদুয়া ও রাজানগর উভয় অঞ্চলই মুসলিম বাঙালী অধ্যুষিত ছিলো, এবং রাজানগর রাজবাড়ী অভ্যন্তরেই রাজপরিবারের মালিকানাধীন ভূমিতে মসজিদ ও কবরস্থান বিদ্যমান। সুতরাং তাদের একাংশের ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া অবধারিত সত্য। বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় ধারণা, এ সত্যটির প্রতি সমর্থন দান করে, যথা।

ক) 'চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভুত। তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্ত-বিবাহে আবদ্ধ।

(সূত্র ঃ প্রাভীন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৪১০/১৯৪১ খ্রীঃ

খ) 'চাকমারা আধা বাঙ্গালী। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও তাই, আর ভাষাটিও একজাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলো পর্যন্ত এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।'

(সূত্র ঃ চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ জীম সেনের চিঠি নং-২২৭ এইচ, তাং-৫/৯/১৮৭৯ খ্রীঃ)

গ) 'সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকে মোগল ধর্ম গ্রহণ করে ও তাদের অনুগত হয় এবং খোদ চাকমা প্রধানরাও মুসলমানী নাম খেতাব ধারণ করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, ও তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হোন। তবে শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে ও হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়।'

(সূত্র ঃ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ খ্রীঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অংশ)

উপরোক্ত উদ্বৃতিগুলো ঃ চাকমা মৌলিকতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। এগুলো প্রমাণ করে চাকমা ও বাঙ্গালীরা পরস্পরের রক্তের অংশীদার। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো ঃ আজকাল সে অতীত আত্মীয়তা বিস্মৃত। বিশেষতঃ চাকমা সমাজ চরমভাবে মুসলিম বিদ্বেষী। অথচ তাদের পন্ডিতরাই দাবী করেনঃ চাকমা রাজা ধারা মিয়া বা ধরম্যা জনৈকা

মোগল কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই দম্পতিরই সন্তান হলেন মোগল বা মোগল্যা। রাজা ভুবন মোহন রায়ের তালিকা অনুযায়ী তিনি হলেন ৩৩তম চাকমা রাজা। আজ সে রক্তের সম্পর্ক দূষিত হয় কেমন করে?

বলা হয়ে থাকে ঃ অবাঙ্গালী পর্বতবাসীদের সাথে সম্পর্ক দূষিত হওয়ার কারণ বাঙ্গালীদের অত্যাচার ও শোষণ। উদাহরণ টানা হয়েছে যে, অভাবী পাহাড়ীদের বাঙ্গালী মহাজনেরা চড়া সুদে ঋণ দিতো, যা যথাসর্বস্ব দিয়েও শোধ করা যেতো না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, এটা একটি ফাঁকা অভিযোগ। মোগল আমলে তো বটেই, বৃটিশ আমলেও অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক হিন্দু মহাজনই এই সুদ ব্যবসায় জড়িত ছিলো। তাদের দমনের দায়িত্ব ছিলো সরকারের। মুরব্বী হেডম্যান ও চীফেরা তার প্রতিকার চাওয়ার অধিকারী ছিলেন। গুটিকয়েক হিন্দু মহাজন, বস্তুত পাহাড়ী সমাজপতি ও সরকারী প্রশাসনের মোকাবেলায় অতি তুচ্ছ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও, তাদের দ্বারা কেমন করে শোষণ ও নির্যাতন সম্ভব ছিলো? তদুপরি ওরা গোটা বাঙ্গালী সমাজের প্রতিনিধি ছিলো না। মুসলিম বাঙ্গালীরা তো ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাতেই চিরকল সুদের কারবার থেকে বিরত। সামাজিক ভাবেও এ কাজটি তাদের কাছে ছিল হামেশা ঘৃণিত। মুসলমান সমাজ কর্তৃক সুদখোরেরা সমাজচ্যুত হয়ে থাকে। হিন্দুদের মাঝেও অতি নগণ্য সংখ্যক লোক এ পেশার সাথে জড়িত হোন। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ছিলো অতি নগণ্য। ১৯৪১ সালের আমদশুমারীতে তারা ছিলো শতকরা আড়াই জন। আর ১৯৫১ সালে শতকরা ৮/৯ জন। তদুপরি স্থানীয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন স্থানীয় উপজাতীয় প্রধানরা। তবুও যদি কতিপয় হিন্দু মহাজনের দ্বারা শোষণ অত্যাচার হয়ে থাকে, তাহলে ভাবতে হবে, প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্বের তাতে সায় ছিলো। সাধারণ বাঙ্গালীরা এর দায়ভার বহন করে না। সামগ্রিক ভাবে বাঙ্গালীদের উপর শোষণ অত্যাচারের দোষ আরোপ করা নেহাতই ভুল। তদুপরি অতীতে উপজাতীয় মহাজনী শোষণ সত্য হলেও তাকে দোষারোপের পর্যায়ে আনা হয়নি।

এটা বিস্ময়কর যে, লোক বসবাসের যোগ্য, টিলাময় সমতল প্রাচীন আবাদী এলাকা হলেও, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার সীমানা ছেড়ে, পূর্বের পাহাড়ী পাদদেশ ধরে সীমান্তের দিকে ভিতরে চট্টগ্রামী বাঙালীদের কোন বসতি নেই। পাহাড়ের মাঝে কিছু তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রধানতঃ কিছু মগ বা মারমা বসতি মাত্র দূরে দূরে বিদ্যমান। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলেই মাত্র কিছু অস্থানীয় বাঙালীর বিস্তার ঘটেছে। তবে চট্টগ্রামী বাঙালীদের নিজেদের সংলগ্ন অঞ্চলে বিস্তার না ঘটার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, তারা জুমজীবী পাহাড়ীদের না ক্ষেপাবার উদ্দেশ্যে, আপোষে পাহাড়ী জুম ক্ষেত্রগুলোকে এড়িয়ে থাকতেন, অথবা পাহাড়বাসী অরাজক উপজাতিদের ভয়ে, নিজেরা সমতলে সীমাবদ্ধ থাকাকেই নিরাপদ মনে করতেন। তৃতীয় কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিলো যে, তখনো সমতলে জমির প্রাপ্যতা ছিলো ব্যাপক, এবং সমাজবদ্ধতা ছিলো প্রয়োজনীয়। প্রশাসন ও সমাজপতিরা, পাহাড়ী ও বাঙালীদের মাঝে

পারস্পরিক সংঘর্ষ এড়াতে, উভয়ের জন্য পৃথকীকরণ নীতি হিসাবে, পাহাড়ে ও সমতলে বসবাসের সীমারেখা টেনে থাকতেও পারেন।

১৮৬০ সালের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিলো বৃহত্তর চট্টগ্রামেরই অংশ। তখনকার পাহাড়ী বাঙালীদের সবাই ছিলো চট্টগ্রামী পরিচিত। পাহাড়ে বসবাসের ব্যাপারে বাঙ্গালীদের উপর কোনরূপ পীড়ন ও বাধা নিষেধ না থাকাতে, চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের দ্বারা পার্বত্য অঞ্চল ঘনবসতিপুর্ণ হয়ে যাওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। ঔপনিবেশিক বৃটিশ কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রামীদের নিজেদের আপন জন্মভুমিরই এই পূর্বাংশে প্রবেশ ও বসবাস থেকে বঞ্চিত করে বেনামিতে জারি করেন প্রশাসনিক আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন রচিত পাবত্য শাসন আইন ধারা নং ৫২এবং পাশাপাশি আরাকানী, লুসাই, বর্মী ও ত্রিপুরাদের জন্য অভিবাসন ও অনুপ্রবেশের ঢালাও সুযোগ করে দেন। পরিণামে এতদাঞ্চল হয়ে দাঁড়ায় উপজাতি অধ্যুষিত একটি পকেট, যেখানে বাঙালীরা হয়ে পড়ে সংখ্যালঘু। অবাঙালী সংখ্যা প্রাধান্যের উৎসাহে বাংলাদেশ আমলে রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা প্রসূত, উপজাতীয় অশান্তির সূত্রপাত হয়। এই উৎপাত ও উচ্চাশা একদিন বিচ্ছিন্নতার দিকে মোড় নিবে, এই ভয়ে, উপজাতীয়দের স্থানীয়ভাবে সংখ্যালঘু করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই সুত্র ধরে বাঙালী পুনর্বাসনের শুরু। বৃটিশ আমলের বাঙালী রোখার শেষ পরিণাম উপজাতি বিদ্রোহ। নতুবা একচ্ছত্রভাবে আদি চট্টগ্রামী বাঙালীদের দ্বারাই পর্বতাঞ্চল হতো ঘন অধ্যুষিত। বস্তুত চট্টগ্রামীরা পর্বতাঞ্চলে পাহাড়ীদের মত অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী। নিজভূমে তারা পরবাসী। এই ধারণাতেই পাহাড়ী বাঙালী আর স্থানীয় অস্থানীয় বিরোধ। এতদাঞ্চল আদি চট্টগ্রাম ভূমি। তাই চট্টগ্রামীরা এখানকার আদিবাসিন্দা গণ্য হওয়ার যোগ্য। এ পথেই স্থায়ী শান্তি আসা সম্ভব। তখন প্রয়োজন হতো না অস্থানীয় পুনর্বাসনের। দুই আদি প্রতিবেশীদের সহাবস্থান ও সমঝোতার নীতি গ্রহণ, শান্তি স্থাপনকে নিশ্চিত করতে পারতো। তখন বিচ্ছিন্নতার দোষারোপ থেকেও পাহাড়ীরা বাঁচতো। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো ঘন বসতিপূর্ণ হয়নি। এখনো এতদাঞ্চল কম লোক বসতিপূর্ণ সর্বাধিক সম্পদশালী এলাকা। এখানে আরো কয়েকগুণ বেশি লোকজনের স্বচ্ছন্দ সংস্থান সম্ভব। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও আরাকান আরো অধিক ঘন লোক অধ্যুষিত। বহিরাগমন ছাড়াও স্বাভাবিক জন্ম বৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে। আগন্তুক শিশুদের যেমন ঠাঁই পাওয়ার অধিকার আছে, তেমনি ভূমিহীন ও বাস্তুহারাদের ও স্বদেশে কি বিদেশে আশ্রয় পেতে হবে। ভূমি ও খাদ্য সংকটের ভয়ে সে মানবিক চাহিদা থেকে পিছপা হওয়া যায় না। উৎপাদন সম্পদ সৃষ্টি ও মেধা ব্যবহারের মাধ্যমেই, অভাব পূরণ সম্ভব। অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণ বাদ সমাধান নয়।

পূর্বের ঐ পাহাড় শ্রেণী ক্রমান্বয়ে কাছে থেকে দূরে উঁচু ও দুর্লঙ্ঘ্য। উত্তরের দিকেও তাই। উত্তর ও পূর্বের ঐ দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ী দেওয়াল যেন বিদেশের আগ্রাসন থেকে রক্ষাকারী এক প্রাকৃতিক চৌকি। ত্রিপুরা, লুসাই ও আরাকানকে ঠেলে দূরে রাখছে

ঐ পাহাড় শ্রেণী। নদী, উপনদী, ছড়া খাল ও পাহাড়ের ঢাল, সবই চট্টগ্রামের দিকে প্রবাহিত। তাই প্রাকৃতিকভাবেই চট্টগ্রাম হলো এতদাঞ্চলের জীবনমুখী সম্মুখভূমি। পশ্চাদভূমি ঐ আরাকান, মিজোরাম ও ত্রিপুরা এর স্বাভাবিক যোগাযোগ ক্ষেত্র নয়। জীনন-যাপনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতাই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যকে চট্টগ্রাম ও বাঙালীদের সাথে জড়িত করে রেখেছে। তাই জটিলতার সমাধান এই স্বাভাবিক পথ ধরেই খুঁজে নিতে হবে।

বাঙালীরা উপজাতি বৈরী নয়। বাংলাদেশও তাদের পক্ষে বৈরী-রাষ্ট্র নয়। বাঙালী সদিচ্ছার বর্হিপ্রকাশ সর্বত্র বিদ্যমান। পদুয়া ভেদী প্রাচীন কাঁচা সড়কটির নাম এখনো স্থানীয় বাঙালীরা রাণী কালিন্দির নামে ধরে রেখেছে। এখনো শুক বিলাস রাজারহাট ও রাজভিলার নাম বহাল আছে। বাঙ্গালী অধ্যুষিত রাঙ্গুনিয়ার রাজারহাট রাজানগর ও রাণীরহাটের নাম পরিবর্তনে কোন বাঙালী এগিয়ে আসেননি। এখনো স্থানীয় বুড়ো বুড়িরা, চাকমা রাজাদের নামে ভক্তি গদগদ হোন। বলেন, আমাদের রাজা। স্থানীয় বাঙালী বৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা, আমাদের সাথে হেঁটে ঐ রাজা রাণীদের স্মৃতি চিহ্নসমূহ দেখিয়েছেন। ঐ রাজাদের স্থাপিত মন্দির, মসজিদ, কবরস্থান, দীঘি ও ফুল বাগিচার কথা বলে বলে তারা গর্ব অনুভব করেছেন। এটা অতীত সম্প্রীতি ও একাত্মতার রেশ।

চাকমা ভাষা, ঐতিহ্য, নাম ও খেতাব হলো, বাঙালী মুসলিম সমাজ ও চাকমা সমাজের সম্প্রীতি ও নৈকট্যের জলন্ত যোগসূত্র । উভয়ের সামাজিক পরিভাষা প্রায় অভিন্ন, যথা ঃ খোদা, দোজখ, সালাম, হুগুম, (হুকুম), কালাম, ইবিলিস (ইবলিস), হুজুর, বিবি, আদম, হেমান (হাওয়ান) ইদৎ, (ইয়াদ), মর্দ, দিল, আকল, তাকৎ ইত্যাদি।

পাহাড়ীদের পক্ষে অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণমূলক আইনগুলো ক্রমেই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় একতায় বিভাজন সৃষ্টি করছে। উপজাতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ আইনী মর্যাদা, রাজনৈতিকভাবে এতদাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীকারকে ক্রমেই শক্ত ভিত প্রদান করছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে একদিন এতদাঞ্চল বলতে পারবেঃ কোন বিবেচনায়ই বাংলাদেশ উপজাতিদের জাতীয় রাষ্ট্র নয়। সে উপজাতিদের আশা-আকাঙ্খার বিপক্ষ বৈরী দখলদার রাষ্ট্র। এর রাজনৈতিক অবসান কাম্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এক-দশমাংশ অংঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিস্তৃত। অথচ এর অবাঙালী জনসংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার আধা শতাংশ মাত্র। প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাবে এটি প্রায় অর্ধেক বাংলাদেশ। বনজ ও খনিজ সম্পদের আকর এতদাঞ্চলের পাহাড় ও বনাঞ্চল, চিরকাল যাবৎ জাতীয় সম্পত্তিরূপে বিবেচিত। সংরক্ষিত বন, রাষ্ট্রীয় বন, খাস পাহাড় হ্রদ ও শিল্পাঞ্চলগুলো জাতীয় সম্পত্তি। মোট ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তনের ভিতর ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল জুড়ে এই জাতীয় সম্পত্তির বিস্তৃতি। অবশিষ্ট ৪৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র স্বীকৃত বসতি অঞ্চল। স্থানীয় শাসন এই

বসতিভুক্ত ৭/৮ শতাংশ অঞ্চলের উপরই প্রযোজ্য। বাকি ৯০/৯২ শতাংশ অঞ্চল কেন্দ্রীয় এখতিয়ারাধীন এলাকা। তবে এই কেন্দ্রীয় এখতিয়ার স্থানীয় মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা বিভ্রান্তিতে পরিণত। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বহির্ভুত সমুদয় জায়গা জমিতে এই মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন বিস্তৃত, যা উপজাতীয় মৌজা প্রধান হেডম্যান ও সার্কেল প্রধানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর দ্বারা জাতীয় সম্পত্তির বৃহদাংশ উপজাতীয়দের দখলাধীন বলে অনুমিত। এই দখলদারীত্বের বলেই তাদের দাবী হলো : গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই উপজাতীয় ভূমি। এর প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় তহসিলদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন উপযুক্ত বিবেচিত হলেও তা নির্বাহী পর্যায়ে কার্যকর করা হয়নি। এই ভুলের খেসারত হলো : উপজাতীয় ভূমি অধিকারের দাবী। এখনো ঐ ভুলের প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় তহসিলদারী প্রবর্তিত হলে হারানো ভূমি অধিকার রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারে ফিরে আসতে পারে। নতুন করে তহসিলকরণ ব্যবস্থা অবশ্যই উপজাতীয় ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। সুবিধাভোগী মহল এর শক্তিশালী বিরোধীতায় নামবে। এখনই তারা ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বনায়ন প্রতিরোধে সংগঠিত আন্দোলনে তৎপর। এতদসত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রগণ্য। তহসিলকরণ ব্যবস্থাই সর্বোত্তম রাষ্ট্রীয়করণের পথ। তাতে বিক্ষোভ বিদ্রোহ সত্বেও ভূমিগত শক্তি হারিয়ে তারা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সাথে সাথে রাষ্ট্রশক্তি হবে প্রবল। ১৭৯১ খ্রীঃ সালেই পার্বত্য অঞ্চলসহ গোটা চট্টগ্রামে তহসিল ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জুম চাষ বন্ধ আর জুম চাষাধীন পাহাড় ও বন থেকে তুলাকর তুলে দিয়ে, নগদ টাকা ১৭৭৫/০০ বার্ষিক হারে, রাজা জান বখশ খাঁকে জুম নোয়াবাদের ইজারা মঞ্জুর করা হয়। ঐ জুম নোয়াবাদ ইজারার স্থলাভিষিক্তি হয় রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন রচিত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন অনুমোদিত মৌজা ও সার্কেল প্রশাসন। উপেক্ষিত হয় তহসিল ব্যবস্থা, যা বর্তমান ভূমি অধিকার মূলক বিভ্রান্তির মূল সূত্র । এখন পুনরায় সে আদি ও আধুনিক তহসিল নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ফিরৎ যাওয়াই সমাধান। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি রাজস্বের বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ অনভিপ্রেত। দেশের কোথাও এরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। সংগৃহীত করের বৃহদাংশ সংগ্রাহকদের প্রাপ্য হতেও পারে না। যেমন জুম করের জত(৫,৬) হেডম্যান ও চীফদের প্রাপ্য। ভূমিকর সহ আরো কিছু করের উপর ও তাদের কম বেশ ১০% কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়। এ হলো মালিকানাহীন জমিদারী। সারা উপমহাদেশ ব্যাপ্ত ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য আর অসংখ্য জমিদারী আজ বিলুপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশ স্বীয় পার্বত্য অঞ্চলে মালিকানাহীন জমিদারী বহাল রেখেছে। তাতে না জমিদাররা সন্তুষ্ট, না দেশ উপকৃত।

১৭৮৭ খ্রীঃ সালে রাজা জান বখশ খানের বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ন ওয়ালিসের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সশস্ত্র বৃটিশ বিরোধিতার অবসান হয়। কিন্তু তাকে নিজ সদর দপ্তর পদুয়ার পরিবর্তে উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে স্থানান্তরে বাধ্য করা হয়। কারণ বিদ্রোহী সঙ্গী সাথী রনুখাঁ, মুন গাজি ও কুকি দলপতিদের

নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ বিরোধী কার্যক্রম তখনো সক্রিয় ছিলো। বৃটিশদের লক্ষ্য ছিলো জান বখ্‌শ খাঁকে ঐ বিরোধীদের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। রাজকীয় মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে, বৃটিশ আনুগত্য মেনে নেয়া ছাড়া জান বখ্‌শ খাঁর কোন উপায় ছিলো না। দশ বছরের অসম প্রতিরোধ যুদ্ধে তার এই প্রতীথি জন্মেছিলো যে, বৃটিশ শক্তি অপরাজেয়। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মানে নিজেরও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধিকে স্থায়ী ও নিশ্চিত করা। আক্রমণ ও আত্মগোপনের গেরিলা যুদ্ধে বৃটিশদের ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য করা গেলেও, তাদের অবরোধ পার্বত্য অঞ্চল ও তার জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করে। সমতলের সাথে কাজ কারবার ও যোগাযোগ ব্যাহত হয়। প্রশাসনিক স্থবিরতা ও পলায়ন পরতায় স্বাভাবিক জীবন হয় পর্যুদস্ত। শান্তি ও স্থিতিশীলতার অভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হয় বিপর্যস্ত। বনজ পণ্য ও কৃষি উৎপাদন হয় ব্যাহত। এই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখা আত্মহনন তুল্য। সুতরাং সহযোদ্ধাদের অমতেই তিনি আত্মসমর্পণ ও সদর দপ্তর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিত্যক্ত হয় রাজভিলা ও শুকবিলাস। গড়ে তুলেন নতুন সদর দপ্তর রাজানগর। শিলক নদীমুখের বিপরীতে কর্ণফুলীর অন্যতম উত্তরমুখী উপনদী ইছামতির ৪/৫ মাইল ভিতরের আধা পাহাড়ী এলাকারই নদীতীরবর্তী সমতলের একটি বাঁকে, গড়ে তোলা হয় বাড়িঘর ও লোকবসতি। নাম দেয়া হয় রাজানগর। কাছে দূরে গড়ে ওঠে হাট বাজার। তা পরিচিত হয় রাজার হাট ও রাণীর হাট নামে। তবে পদুয়ার মত এই এলাকটি ও বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে কচিত দু-এক ঘর চাকমা ও মগ দৃষ্ট হয়। এটি কি অতীত প্রতিচ্ছবি, এ বলা মুশকিল। তবে স্থানীয় বাঙালীরা চাকমা রাজ বংশীয়দের ভক্তি শ্রদ্ধায় এখনো গদগদ। বলেন ওরা আমাদের রাজা। তাদের ঐ ভক্তি শ্রদ্ধার নির্দশনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজা ভুবন মোহন রায় উচ্চ বিদ্যালয়, যা রাজানগর রাজাবাড়িরই দীঘির পাড়ে রাজার হাটের উত্তর অংশে অবস্থিত। অথচ ঐ রাজারা এখন নেই। তবে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ সালে রাঙ্গামাটির বালুখালীতে সদর দপ্তর স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছরকাল রাজানগর রাজাবাড়ী ছিলো চাকমা আভিজাত্যের কেন্দ্রবিন্দু। সে পর্যন্ত চাকমা রাজপরিবার ছিলেন নাম খেতাব ও আচরণে বিশুদ্ধ মুসলিম মোগলাই ঐতিহ্যের অনুসারী।

জান বখশ খান স্বীয় সীলমোহরে নিজেকে মহারাজ উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তার প্রতিষ্ঠাকাল ১১৪৫ সন বলে খোদিত আছে। এটাই অকাট্য প্রমাণ যে, তারা পারিবারিকভাবে জমিদার মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, স্বাধীন রাজা নন। মঘী হিসাবে তার প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৭৮৩ খ্রীঃ যখন তিনি পিতা শের দৌলৎ খার অবর্তমানে নিজেই বৃটিশ বিরোধী প্রধান বিদ্রোহী নেতা। জান বখ্‌শ খাঁর উত্তরাধকারী প্রধান ছেলে তব্বার খাঁর ক্ষমতার স্মারক কোন সীলমোহর নেই। তবে তাঁকে পরবর্তী রাজা জ্ঞান করা হয়। ডঃ ফ্রান্সিস বোকা নন হেমিলটন, স্বীয় পুস্তক ইন সাউথ ইষ্ট বেঙ্গল এর বর্ণনা মতে তব্বার খান, তার ভ্রমণকাল ১৭৯৮ সালে সম্ভবত পিতার পক্ষে কার্য

পরিচালক ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সরকারী বিবরণ সুত্রে অবগত হওয়া যায়, তিনিও বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। প্রতিরোধ যুদ্ধ ভেঙ্গে গেলেও অন্যান্য নেতাদের মত তিনিও পাহাড়াভ্যন্তরে নিরাপদ স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়ে, রাঙ্গামাটির হাজারী বাঁক এলাকার পাহাড়ে, আস্তানা গেড়েছিলেন, যেটির নাম কিল্লামুরা। সীলমোহর সুত্রে পরবর্তী রাজা হলেন জব্বার খান, যার প্রতিষ্ঠাকাল হলো ১৮০১ সাল। তিনি হলেন ধর্মীয় বিভ্রান্তির হোতা। তার সীলমোহরে অংকিত আছে ঃ শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ তারা জব্বার খান ১১৬৩। 'লেখা আরবী, ভাষা বাংলা, কালি নারায়ন তারা দেবতার প্রতি ভক্তি ও মঘীসন সুত্রে বলা যায়, ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের প্রতি একাত্মতার দীর্ঘ অনুসৃত পারিবারিক ঐতিহ্য ভেঙ্গে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে ধর্মীয় বিভ্রান্তির সূচনাকারী ব্যক্তি। তদীয় পুত্র ধরম বখ্‌শ খাঁ ও তাই। মুসলিম নাম খেতাব, আরবী ভাষা ও বর্ণ এবং ইসলামী বাক্য আল্লাহু রাব্বির মাধ্যমে ১৭৩৭ সাল থেকে এই পরিবারের ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের প্রতি একাত্মতার দীর্ঘ ৬৪ বছরের মাথায় এসে তা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই বিবর্তন ১৩৭ বছরের মাথায়, হরিশচন্দ্র রায়ে পৌঁছে পুর্ণতা লাভ করে। তৎপর কেবল মোগলাই পোশাকী ঐতিহ্যই বহাল আছে। এখন রাজারা অভিষেক ও পুন্যাহ অনুষ্ঠানে, যদি তা অনুষ্ঠিত হয় ঃ মাথায় মোগলাই কায়দায় পাগড়ি বাঁধেন, গায় চড়ান শেরোয়ানী আচকান, কোমরে বাঁধেন খাপ সজ্জিত তলোয়ার। আমির উমারা সদৃশ গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্মকর্তা আর প্রজাদের সমবেত দরবারে তিনি কুর্ণিশ নেন, গ্রহণ করেন নজর নিয়াজ ও উপঢৌকন। এই অবশিষ্ট মোগলাই ঐতিহ্য বাদে, চাকমা রাজারা বর্তমানে পরিপূর্ণ অমুসলিম। ধর্মত এবং নাম উপাধিতেও তারা এখন বৌদ্ধ। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসটিও রাণী কালিন্দির শেষ জীবনে এসে পরিত্যক্ত হয়েছে।

শের মস্ত খাঁই এতদাঞ্চলের প্রথম চাকমা প্রধান হওয়ার সুত্রে ১৭৩৭ সালকে ক্ষুদ্র একদল চাকমা এতদাঞ্চলে আগমন ও বসবাসের সূচনাকাল ধরা হয়। তার পূর্বের স্বদেশ ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে হিসাবে আনা এখানে প্রাসঙ্গিক। একটি ঐতিহ্য গড়া ও ভাঙা সময় সাপেক্ষ। তাই বলা যায়, তাদের ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য অবশ্যই পূর্বকালীন। আরাকানে ও তাদের পরিচিতি তাই ছিলো। শের জব্বার খাঁর সীলমোহর তাই বলে।

সীলমোহর হলো ক্ষমতার প্রতীক। তাতে ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার অপ্রয়োজনীয়। তবু শের জব্বার খাঁর দ্বারা সে ঘোষণা দান, প্রমাণ করে, তিনি ইসলামের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও বিশ্বাসকে ক্ষমতার সমান চর্চনীয় মনে করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারো কারো ক্ষীণ ধারণা হলোঃ চাকমারা অতীতে এতদাঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। বৃটিশ ঔপনিবেসিক শক্তি তা দখল করার চেষ্টা করায় ১৭৭৬ সালে চাকমা রাজা শের দৌলৎ খাঁ তা প্রতিরোধে লিপ্ত হোন। ঐ প্রতিরোধ যুদ্ধকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চাকমা বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এখন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, কোন অতীত বিবরণে স্বাধীন চাকমা রাজ্যের এতদাঞ্চলের কোথাও প্রতিষ্ঠিত থাকা সমর্থিত হয় কিনা। অথবা ঐ প্রতিরোধ যুদ্ধটি সাধারণ পূর্ব ভারতীয়দের মত দখলদার বৃটিশদের বিরুদ্ধে সার্বজনীন স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ বলেও প্রমাণিত হয় কিনা।

চাটগাঁর কানুনগো দপ্তরে রক্ষিত রেকর্ড পত্রের ভিত্তিতে রচিত অধ্যাপক এ এম সিরাজুদ্দিনের গবেষণা পত্র রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ আছে ঃ শের মস্ত খাঁ নামীয় জনৈক চাকমা সর্দার আরাকান ত্যাগ করে চাটগাঁর মোগল শাসক জুলকদর খানের আশ্রয় লাভ করেন। ১৭৩৭ সালে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার মাওদা অঞ্চলে তাকে কিছু পাহাড়ী জমি বন্দোবস্ত ও পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুমকর আদায়ের নিযুক্তি, প্রদান করা হয়। তিনি স্বীয় খামার আবাদের বাজে কিছু চাকমা চাষী নিযুক্ত করেন। এই হলো এতদাঞ্চলে চাকমা বসতি বিস্তারের সূচনা পর্ব।

ঐ রচনায় দ্বিতীয় আরেক পাহাড়ী সর্দার বংশের স্বল্পস্থায়ী ১৩ বৎসরের বসবাস ও প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে, যারা চন্দন খাঁ বা তৈন খাঁ বংশ নামে পরিচিত। ১৭১১ থেকে ১৭২৪ সাল হলো এ বংশের প্রতিপত্তি কাল। তাদের প্রভাবিত অঞ্চল হলো মাতামুহরী উপত্যকার একটি ক্ষুদ্র সীমান্তবর্তী এলাকা। এই বংশের শেষ সর্দার জালাল খাঁ আরাকানী রাজ আনুগত্য ত্যাগ করে, মোগল পক্ষ অবলম্বন করেন এবং কর দিতে চুক্তিবদ্ধ হোন। অবশেষে তিনি ১৭২৪ সালে বিদ্রোহ করায় দোহাজারীর মোগল ফৌজদার কিষণ চাঁদ কর্তৃক আক্রান্ত ও সদলে বিতাড়িত হন। তার ১৩ বছর পর শের মস্ত খাঁনের আগমন ঘটে। চন্দন খানের তৈন খান উপাধির সুত্রে অনুমান করা যায়, তিনি সীমান্তবর্তী তৈনছড়ি অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। চাকমাদের দাবী হলো : ধাবানা নামীয় তাদের জনৈক রাজা ঐ তৈনছড়ি মুখে বাঁশ বেতের সিংহাসনে আরোহন করে, অন্য রাজপদ প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়ী হয়েছিলেন। এই দুই বংশ একই চাকমা সমাজভুক্ত কিনা তা নিশ্চিত নয়। তবে চাকমা লোক কাহিনীতে চানান খাঁ নামধারী রাজ পুরুষ আছেন। এটা উচ্চাভিলাষী সংযোজন হতেও পারে। কারণ উৎখাতকৃত বিদ্রোহী বংশের অপর এক সর্দারকে মাত্র ১৩ বছরের ব্যবধানে জমি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পুনর্বাসন দান করা সন্দেহজনক। একমাত্র রাজা ভুবন মোহন রায়ই স্বীয় পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে প্রথম এই সংযোজক সাধন করেছেন। অথচ তার উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ রাণী কালিন্দি স্বীয় মন্দির গাত্রের বাণীতে শের মস্ত খাঁর পূর্ববর্তী কোন রাজাকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি ও লোককাহিনীকারদের সবাই শের মস্ত খাঁকেই আদি রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাজা ভুবন মোহন রায় ও তার পরবর্তীদের প্রদত্ত দীর্ঘ রাজতালিকা ও তাদের গুণকীর্তন, নিরেট উচ্চাভিলাষী সংযোজন। তাদের এতদাঞ্চলে রাজ ক্ষমতার অধিকারী হওয়াটাও ভুয়া। এই রাজত্বের দাবীর পক্ষে মোগল ইতিহাস, রোসাং ইতিহাস ও ত্রিপুরা ইতিহাস নীরব। প্রমাণ সুত্র হিসাবে

কোন মুদ্রা, ধ্বসাংবশেষ, ঘোষিত রাজধানী ও বহির দেশীয় যোগাযোগ পত্রের কোন হদিস নেই। বহুল কথিত কল্প নগর ও চম্পক নগরের অবস্থান বহির দেশের কোথায় তাও অজ্ঞাত। রাঙ্গামাটির প্রতিষ্ঠাকাল বৃটিশ আমল, যেটির রাজধানী হওয়া উপহাস্য।

চাকমা লোকগীতিতে আছে ঃ

এলে মৈসাং লালচ নেই,

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই,

চল ভেই লোগ চল যেই,

চম্পক নগর ফিরি যেই!'

এটা হলো লোক স্বীকৃতির প্রমাণ যে, অতীতে চাকমারা মগ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ছিলো ও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বদেশভূমি চম্পক নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তাদের সর্দার ছিলেন মৈসাং নামক জনৈক ব্যক্তি, যার দোদুল্যমানতায় তারা তার প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন। সেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে অবস্থিত ছিলো বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল, যেটি ছিলা তখন মগমুক্ত নিরাপদ ও জনবিরল। অধিকন্তু সুদূর অতীতে পরিত্যক্ত স্বদেশভূমি চম্পক নগরের হদিস ও অবস্থান সম্পর্কেও তাদের স্মৃতি ছিলো বিভ্রান্ত। তাদের আদি অভিযাত্রী রাজা, সুদূর অতীতে এমনি স্বদেশ চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তনের মাঝপথে এ কারণে যাত্রা বিরতি করেছিলেন যে, পিতার মৃত্যুতে ছোট ভাই উদয় গিরি সিংহাসন দখল করে নিয়েছেন। বড় ভাই বিজয় গিরি সেখানে অবাঞ্ছিত। সুতরাং মৈসাংপক্ষীয়দেরও সেখানে অভ্যর্থিত হওয়া অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামেই তারা অবস্থান গ্রহণ করে। এই বক্তব্যটি রাধামোহন ধনপতি পালাও চাটি গাং ছাড়া পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং চাকমাদের আদি স্বদেভূমি বা রাজ্য কোন এক অজ্ঞাত চম্পক নগর যার অবস্থান বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত। স্মৃতির মনিকোঠায় ও বাংলাদেশভুক্ত কোন স্বাধীন রাজ্য থাকার কথা ধারণকৃত নেই। নতুবা বর্ণিত লোকগীতিতে তার বর্ণনা সংযোজিত হতো।

চাকমা কৌলিন্য ও আভিজাত্যের প্রথম বক্তা হলেন রাণী কালিন্দি ও দ্বিতীয় বক্তা রাজা ভুবন মোহন রায়। এই দুজনের অতীত স্মৃতি বক্তব্যই সর্বাধিক চর্চিত। রাণী কালিন্দির মন্দির গাত্রের লেখা এবং রাজা ভুবন মোহন রায়ের পুস্তিকা চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসের বর্ণনার কোথাও এ দাবী নেই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কোথাও অতীতে কোন স্বাধীন চাকমা রাজ্য ছিলো। অধুনা অতি উৎসাহী কিছু পন্ডিতের অনুরূপ দাবী উত্থাপন সম্পুর্ণ আজগুবী। বিদ্রোহী রাজা শের দৌলৎ খাঁ ও জান বখশ খাঁ থেকেও অনুরূপ কোন ফরমান বা দাবী থাকা প্রমাণিত নয়। তাদের নিকট

কালের বংশধর ও উত্তরাধিকারীরাও এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য রেখে যান নি। এই অতি গুরুত্বপুর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যাপারটি বাস্তব হয়ে থাকলে, কোন না কোন সূত্রে তার কিছু বর্ণনা ক্ষুদ্রাকারে হলেও থাকা সম্ভব ছিলো। চট্টগ্রামী স্মৃতিকথা, বই পুস্তক, আর গল্প গুজবেও তার কিছু রেশ পাওয়া যেতো। কিন্তু বিষয়টি সবাংশে উহ্য। এটাই সম্ভব যে, এতদাঞ্চলে প্রাচীন চাকমা রাজ্য থাকার হাল-আমলকার কিছু পন্ডিতের দাবী, তাদের স্বকপোল কল্পিত। উদ্দেশ্যঃ ঐতিহাসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, উপজাতীয় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে মদদ দান। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপচেষ্টা।

রাজা নগরে কিছু অতীত স্মৃতিচিহ্ন আছে যা মূল্যবান প্রত্নসম্পদ, তবে অবহেলিত। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত ইছামতি নদীর একটি বাঁক মুষ্টিতে, রাজবাড়িটি অবস্থিত। এখানে রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের পিতৃপক্ষীয় একটি পরিবার মাত্র ঘর করে আছেন। বাড়ীর সামনে পূর্ব দিকে পর পর দুটি দীঘি এবং ভিতরে একটি মহলী পুকুর আছে। পূরা চত্বরের দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পড়ো দালান, যার দ্বিতল প্রায় ধ্বসে গেছে এবং নিম্নাংশটিও ধ্বংসোম্মুখ। কোন মেরামতের উদ্যোগ নেই। পরিত্যক্ত ছাড়াবাড়ি এটি। চুন-সুর্কি ও ইটের গাথুনীতে খিলান পদ্ধতির নির্মাণ কৌশলে এটি নির্মিত। ভিতর ও আশপাশ গাছপালা ও বনে ঢাকা। এটির বিশাল ও দ্বিতল অবয়ব ঘোষণা করে ঃ এর মালিকেরা অবশ্যই সম্পদ সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। এবং তাদের কার্যকাল ছিলো প্রথম বৃটিশ আমল, যখন ইটের চুন-সুর্কির গাথুনীযুক্ত খিলান পদ্ধতির মোগলাই নির্মাণ কৌশল প্রচলিত ছিলো। দুই দীঘির মাঝখানে উত্তর দক্ষিণমুখী সড়ক পথের ধারে দক্ষিণ অংশে রাজারহাট আর উত্তর অংশে রাজা ভুবন মোহন রায় উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। পূর্বের দীঘির উত্তর পাড়ে একটি মাজার ও মসজিদ এবং পূর্ব পাড়ের উত্তরাংশে একটি কবরস্থান বিদ্যমান। স্থানীয় জনগণের কাছে এটি হলো রাজাদের মসজিদ, ও কবর স্থানটি তাদের পারিবারিক। এখানে কোন সদ্য কবর নেই। সংলগ্ন মুসলিম পাড়ার কেউ এটি ব্যবহার করেন না। মাজারটি কার, তার কোন সঠিক হদিস নেই।

দেওয়াল লিপি প্রমাণ করে ঃ রাণী কালিন্দি শের মস্ত খাঁকে চাকমা রাজ পরিবারের এতদ্দেশীয় মূল রাজা বা প্রথম প্রধানের মর্যাদা দিয়েছেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করেছেন।

এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ঃ তার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাজা ভুবন মোহন রায়ের প্রদত্ত দীর্ঘ রাজতালিকা এবং পরবর্তীদের দ্বারা তাতে আরো সংযোগ সাধন, নেহাত উচ্চাভিলাষী বাড়াবাড়ি। দুনিয়ার কোথাও এমন অখন্ড ও সুদীর্ঘ রাজ বংশীয় তালিকা থাকা বিরল। এটি যুক্তি ও বিশ্বাসের সীমা লংঘন করেছে। এই অবিশ্বাস্য বাড়াবাড়ি, গোটা চাকমা ইতিহাসকেই অনেকাংশে সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। এ থেকেই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক কথা কাহিনীর যাচাই-বাছাই ও কাট ছাট করার আবশ্যক হয়। বলতে বাধ্য হতে হয়ঃ গোটা চাকমা ইতিহাস হলো সত্য মিথ্যা ও

রূপকথার সংমিশ্রণ। রাণী কালিন্দির পরবর্তী লেখক ও কাহিনীকারদের দ্বারা তা রচিত ও সংযোজিত।

শের মস্ত খাঁকে আদি চাকমা রাজা ধরে নিলেও তার রাজকীয় কোন স্মৃতি নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মাওদা এলাকায় তাকে প্রদত্ত বন্দোবস্তির ফরমান ও পাহাড়ী জুমিয়াদের নিকট থেকে জুমকর সংগ্রহের নিযুক্তি পত্র এবং তার রাজ মর্যাদার পক্ষে প্রদত্ত সনদেরর কোন হদিস নেই।

রাজ পরিবার সূত্রে ১০টি প্রাচীন সীলমোহর প্রকাশিত হয়েছে, যার ধারকরা হলেন যথাক্রমে (১) সোনা বি (২) শের জব্বার খান (৩) নূরুল্লা খান (৪) ফতেহ খান (৫) শের দৌলৎ খান (৬) জান বখশ খান (৭) জব্বার খান ও (৮) ধরম বখশ খান শুকদেব রায় ও একটি চিত্র মহর। এই তালিকার প্রথম চারজন রাণী কালিন্দি ও রাজা ভুবন মোহন রায়ের বর্ণনায় নেই। এর অর্থ কি এটাই যে, এরা চাকমা রাজবংশভুক্ত নন, অন্য লোক? তা হলে এদের সীলমোহর চাকমা রাজ পরিবারের অধিকারে কি করে থাকে? তারা স্বীকৃতি থেকে বাদ পড়েনই বা কি করে বা কি কারণে?

শের জব্বার খানের সীলমোহরটি এ ব্যাপারে কিছু তথ্য প্রদান করে। তাতে আছে রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান ১১১১। আরবী বর্ণে ও অংকে লিখিত এই বর্ণনা। তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় : তার কর্মক্ষেত্র ছিলো আরাকানভুক্ত রোসাং অঞ্চল এবং সে দেশীয় মঘী পঞ্জিকা অনুসারে সে সময়টির শুরু ১৭৪৯ খ্রীঃ সালে। সুতরাং এটাই সম্ভব যে উল্লেখিত প্রথম চারজন আরাকানের রোসাংবাসী মূল চাকমা জাতি গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সর্দার ছিলেন।

শের মস্ত খাঁন সর্দাররূপে আনুষ্ঠানিকভাবে বরিত ছিলেন না। তিনি বিচ্ছিন্ন বিরোধী এক ক্ষুদ্রাংশের নেতারূপে নিজ অনুসারীদের সহ দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কারণেই তার আনুষ্ঠানিক সর্দারীর প্রতীক সীলমোহর নেই।

এখন চাকমাদের বৃহদাংশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস এবং আরাকান, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় নগণ্য সংখ্যায় পরিণত হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে তারা বৃটিশ আমলেই ব্যাপকহারে এতদ্দেশে আগমন ও অভিবাসন গ্রহণ করেছে। সেই অভিবাসনের অবাধ সুযোগ দানের প্রমাণ হলো রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর আওতায় রচিত পার্বত্য অঞ্চল আইনের ৫২ ধারা যথা ঃ

চাকমা, মগ অথবা এমন কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য, যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড়, আরাকান পার্বত্য অঞ্চল অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী বাসিন্দা এমন লোক ব্যতীত অন্য কেউ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার কাছে জেলা প্রশাসকের বিবেচনাধীন মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

আইনটির নাম হলো ঃ পর্বতাঞ্চলে অভিবাসন। এই আইনটির বলেই বেনামে চট্টগ্রামীসহ স্বদেশবাসী বাঙালীরা ছিলো নিষিদ্ধ জন। যদিও অভিবাসন আইনের নিষেধাজ্ঞা স্বদেশবাসীদের উপর প্রযোজ্য নয়।

৬) গৌড় শাসনাধীন আলীকদম ও তৈনছড়ি।

১) দুর্গম পাহাড়ের ভিতর বার্মা সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় মাতামুহুরী নদী উপত্যকার প্রত্যন্ত গভীর অঞ্চল হলো আলীকদম। মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এ নামটি এবং এতদাঞ্চল নিয়ে রহস্যঘেরা কিছু কথা কাহিনী আমাকে বহুদিন যাবৎ বারবার তা পরিদর্শনে আকৃষ্ট করেছে। প্রথম ১৯৭৩ সনে জাতীয় সংসদের ৩০০ নং সীটে ভাসানী ন্যাপের কেন্ডিডেট হিসাবে একবার আমি এতদাঞ্চল সফর করেছিলাম। চিরিঙ্গায় বাস থেকে নেমে মাতামুহুরী নদী চর, টেক কাটা পথ, আর নদী এপার ওপার করে পায়ে হেঁটে সারাদিনে লামা পৌঁছেছিলাম। যাত্রার দ্বিতীয় উপায় ছিলো, লগীঠেলা নৌকায় শুয়ে বসে সারাদিন পরে গভীর রাতে লামায় পৌঁছা। তৎপর একই পয়দল বা নৌকায় আরো গোটা একদিন শেষে গভীর রাতে বা পরের সকালে আলীকদমে পদার্পণ। এখন চিরিঙ্গা-চকোরিয়া থেকে লামা আধ ঘন্টায় এবং আলীকদমে আরা আধঘন্টা সময়ে যন্ত্রচালিত মটর যানে কেবল পৌঁছাই যায় না, কাজ সেরে দিনে দিনে চাটগাঁয় ফিরে আসাও যায়। আশির দশকে নির্মিত উপজেলা সংযোগ সড়কের বদৌলতে এই যাতায়াত সুযোগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

২২ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে রাঙ্গামাটি থেকে আলীকদমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। লক্ষ্য ঃ প্রথমে কক্সবাজার পৌঁছা, সেখানে ঘনিষ্ঠজন জাফর হানাফী ও তাঁর পরিবারের সাথে রাত যাপন এবং পরের দিন তাকে সহ আলীকদম ঘুরে দেখা। কিন্তু বিধি বাম। কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক হানাফী, একটি সরকারী প্রোগ্রামে ব্যস্ত। সুতরাং পরের সকালে একাই আমাকে আলীকদমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হলো। প্রথম কক্সবাজার থেকে কোচে চিরিঙ্গা বা চকোরিয়া, তৎপর চড়াই-উৎরাই করে পাহাড়ী পথে জীপ গাড়িতে, ৪০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়াভ্যন্তরে আলীকদম। এখন পথ ও পরিবেশের যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, আগে তা ছিলো না। আগে ছিলো পাহাড়গুলো ঘন বনে আচ্ছাদিত। পথ ছিলো পাহাড় সঙ্কুল বনঘেরা বা নদী ও ছড়া বাহী খাদময়। তাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি দৃষ্টিগোচর কমই হতো। এখন অধিকাংশ পাহাড় বনহীন নেড়া। সড়কগুলো পাহাড়ের ঢাল ও চুড়াবাহী। তাই দৃশ্যাদি দৃশ্যমান ও উপভোগ্য।

আমাদের জীপটি চকোরিয়া থেকে ফাস্যাখালি হয়ে আলীকদম সড়ক পথে অগ্রসরমান। প্রথমেই নতুন চারা লাগানো ফাস্যাখালি বন এলাকা। এটি ছোটখাটো টিলা ভূমি ও সামনের মেরাইন থং পাহাড়ের চট্টগ্রামমুখী পশ্চিম-ঢাল। কয়েক মাইল

পর খাড়া পাহাড় শুরু। ঘন বিপজ্জনক বাঁক, আর পাশে গভীর খাদ। মাতামুহুরী উপত্যকায় নামতে সড়কটিকে এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় ডিঙ্গাতে হয়। এই আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই সরুপথ প্রায় দশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। পাহাড় শীর্ষের পশ্চিম ঢাল থেকে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ও তার দীর্ঘ বিস্তৃত উপকূল ভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। শরতের পাতলা মেঘ ও ধোয়াহীন সকাল সন্ধ্যায় দৃশ্যমান ঝলমলে সাগর, আর সমতল সবুজ বেলাভূমি, দেখতে অপরূপ সুন্দর।

ফিরতি পথে আমি এই দৃশ্যটি আবার উপভোগ করলাম। মনে হলো ঃ এখানেও পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। পরে তা-ই হয়েছে।

ভিতরমুখী ঢালের উৎরাই পথে দেখা দিলো পূর্ব উত্তরের অদূরবর্তী চিম্বুক পাহাড় শ্রেণী। মাতামুহুরীর দৃশ্যমান উপত্যকা ভূমি ফল ফসলে আর জনবসতিতে ভরপুর। অধিকাংশ বাসিন্দা চাটগেঁয়ে লোক। এলাকাটি উর্বর ও সমৃদ্ধ। মাতামুহুরী ও শঙ্খ নদীকে মাঝখানে রেখে, এই এলাকার বৃহৎ পাহাড়গুলো, দক্ষিণ পূর্ব কোণ মুখী লম্বমান। উত্তর আরাকান পর্যন্ত এগুলোর বিস্তৃতি। তবে এই অঞ্চলে ভূমি ঢাল পশ্চিমমুখী। তাই এই অঞ্চলের নদীগুলো আরাকান সীমান্তে উৎসারিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত আর পশ্চিমমুখী বাঁক নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সমতল নদী উপত্যকাগুলো খুব প্রশস্ত নয়। তবে আধা পাহাড়ী অঞ্চলটি বেশ চওড়া। এ কারণেই উপত্যকা আর আধা পাহাড়ী এলাকার সর্বত্রই জনবসতি বিস্তৃত।

এই নদীপথ প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর আরাকানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। এটি প্রাচীন বসতি অঞ্চলও বটে। এখানকার বিলুপ্ত প্রায় অনেক ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে, এতদাঞ্চলে একটি প্রাচীন সভ্যতা বিদ্যমান ছিলো। লোককাহিনী সুত্রে জানা যায়, আলীকদমের তৈন খাল বা তৈন ছড়িতে প্রাচীন চাকমা আধিপত্য ছিলো। তৈনছড়ির পারে বাঁশ বেতের সিংহাসন পেতে, চাকমা রাজ্যভিষেকের অনুষ্ঠান হয়েছিলো। সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন ধুর্য্যা কুর্য্যা, পীড়া ভাঙ্গা ও ধাবানা এই চার প্রধান পুরুষ। নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে সবার আগে ধুর্য্যা, স্ত্রীর বুক কাপড়ে পাগড়ি বেঁধে, সিংহাসন দখল করেন। তাতে জনসাধারণ কূপিত হয়ে তাকে পদচ্যুত করে। তৎপর ধাবানা শক্তি বলে ঐ সিংহাসন দখল করে রাজা হোন। এই সিংহাসন দখল ও তৈনছড়ি চাকমা রাজ্য শাসন ঘটনা, কিংবদন্তি হলেও বাস্তবে মাতামুহুরী উপত্যকা অঞ্চলে বিস্তৃত চাকমা বসতি থাকার কথা, প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত বিভিন্ন পাড়া পরিবেশের দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই নদীর নিম্নাঞ্চলেও শাখা নদী বাঁক খালির পারে পারে, চাকমার কূল, ফতেহ খাঁর কূল, চন্দন্যার হাট ইত্যাদি অতীত বাস্তবতারই স্মারক।

এতদাঞ্চলে কোন চাকমা রাজ্য থাকার কথা সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখিত নেই। তবে অধ্যাপক এ এম সিরাজুদ্দিন স্বীয় গবেষণা পত্র, রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ উল্লেখ করেছেন, ১৭১১ খ্রীঃ সালে জনৈক চন্দন খাঁ ওরফে তৈন খাঁ

মাতামুহুরী সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র উপজাতীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আরাকানী রাজার অনুগত সামন্ত। তার চতুর্থ পুরুষ জালাল খাঁ, মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করেন ও খাজনা দানে সম্মত হোন। কিন্তু ১৭২৪ খ্রীঃ সালে তিনি বিদ্রোহ করেন। তাতে দোহাজারীতে নিযুক্ত মোগল ফৌজদার কৃষণ চাঁদ, তাকে ও তার লোকজনকে আক্রমণ ও আরাকানে বিতাড়ন করেন। এদের কার্যকাল মাত্র ১৩ বছর ব্যাপ্ত। এবং এরা যে চাকমা ছিলেন, তারও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। নামের দ্বারা বুঝা যায়, তৈন খাঁন তৈন ছড়িরই বাসিন্দা হয়ে থাকবেন। চাকমা কিংবদন্তিতে চন্দন খাঁ নামীয় কেউ নেই। তবে চানান খাঁ নামীয় এক রাজপুত্র আছেন, যিনি রাজা সাথুয়া বা কথিত পাগলা রাজার পুত্র। তিনি ও তার ভাই রতন খাঁ, পিতা সহ নিহত হোন।

২) তৈনছড়ি বা তৈনখাল পাড়াবাসী আমার তংচঙ্গ্যা নাতি ও স্থানীয় বুদ্ধিজীবী শ্রীমান উচ্চতমনি তঞ্চঙ্গ্যার পথ নির্দেশনায় আমি কথিত পাগলা বাজার ভিটা ও তার পাশের পুস্করিণীটি দেখলাম। কোন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হলো না। কথিত আছে, পাগলা রাজা সাথুয়া অনেক সময় ক্ষেপে গিয়ে লোক হত্যা করতেন। তাতে তাঁর প্রতি অনেকে বৈরী ছিলো। একদিন শত্রুপক্ষ রটনা করে দেয় ঃ পাগলা হাতি আসছে। ঐ হাতি দেখতে জানালা পথে মাথা বাড়াতেই পিছনে ওৎ পেতে থাকা লারমা গোত্রের জনৈক প্রতিশোধ পরায়ন ব্যক্তি, অস্ত্রের আঘাতে পাগলা রাজার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরে ঐ দাঙ্গায় তার দুই পুত্র চানান খাঁ ও রতন খাঁও নিহত হোন। রাণী কিছুদিন ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হোন। এই দুর্দিনে হত বিহবল রাজপরিবার অসহায়। রাজকন্যা অমঙ্গলীর সাথে মলিমা থংজা নামীয় জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হয়। এই পক্ষে জন্মগ্রহণ করেন ধাবানা। অমঙ্গলীর দ্বিতীয় বিবাহ হয় কত্তার্য্যা নামীয় জনৈক ত্রিপুরার সাথে। এই পক্ষে জন্মগ্রহণ করেন পীড়া ভাঙ্গা। পরে ধাবানাই তৈনছড়ির রাজ সিংহাসন দখল করে রাজা হোন। ঐ রাজা হত্যার সুত্রেই লারমা গোত্রের একটি শাখা রাজা কাবা গোষ্ঠী বলে ধিকৃত।

পাগলা রাজা সমন্ধে প্রচলিত দ্বিতীয় কাহিনী হলো, তিনি ধর্মভীরু সাধক ছিলেন। বন্ধ ঘরে তিনি নিজ নাড়িভুড়ি বার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আবার যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতেন। একদিন উৎসুক রাণী ছিদ্রপথে ঐ দৃশ্যটি দেখে নেন ও হৈ চৈ করে ওঠেন। ফলে তাড়াহুড়ার ভিতর বহিষ্কৃত নাড়িভুড়ি যথাস্থানে সংস্থাপনে ব্যর্থ হোন। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি পাগল হয়ে যান।

এই পাগলা রাজার মা হলেন রাজকন্যা রাজেম বি ও পিতা বুড়া বড়ুয়া। রাজেম বির পিতা রাজা জানু। তারই সেনাপতি রণ পাগলার সাথে এই তৈনছড়িতে অনেক বার মগদের যুদ্ধ হয়েছে। এবং তার আগের ঘটনা হলো ঃ রাজা অরুণ যুগের রাজ্য ও রাজধানী ছিলো উত্তর আরাকানের মইসাগিরি নামক স্থানে। জায়গাটি চীন পাহাড়ের পূর্ব দক্ষিণ ঢাল ও সীমান্ত নদী কালাদেইনের উপত্যকায় অবস্থিত। চাকমা

আধিপত্যে শংকিত হয়ে আরাকানের মগরাজা মেংদি ঐ অঞ্চল আক্রমণ ও দখল করেন। চাকমা রাজা তিন রাজপুত্র, তিন রাণী, দুই রাজকন্যা, দশ হাজার প্রজা সহ বন্দী হোন ও বহু ধনরত্ন মগ রাজার হস্তগত হয়। দুই রাজকন্যার একজন মগ রাজাও অপরজন তার মন্ত্রী পুত্র কর্তৃক স্ত্রীরূপে গৃহীত হোন। রাজা ও রাজপুত্ররা গৃহবন্দী থাকেন। বন্দী প্রজাদের এংক্ষ্যং অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হয়।

পুরাতন মানচিত্র সুত্রে জানা যায়, এংক্ষ্যং মাতামুহুরী উপত্যকায়ই অবস্থিত একটি জায়গা।

এই নির্বাসন ও উচ্ছেদ সত্বেও আরাকান চাকমামুক্ত হয়নি। দেখা যায় ঃ বন্দী রাজপুত্র ঘাওটিয়া বা ঘাট্যা পরে দলপতি হয়ে গেছেন। তারই ছেলে রাজা মৈসাং। এই মৈসাং এর নামে এখনো চাকমা লোকগীতি প্রচলিত আছে, যথা ঃ

'এলে মৈসাং লালচ নেই,

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই;

চল ভেই লোগ চল যেই,

চম্পক নগর ফিরি যেই।'

ঘরত গেলে মগে পায়

ঝারত গেলে বাঘে খায়

বাঘে ন খেলে মগে পায়

মগে ন পেলে বাঘে খায়।

উভয় সংকটে পড়ে সাধারণ চাকমারা বলছে, চম্পক নগর প্রত্যাবর্তনে রাজা মৈসাং এর আসার প্রতি আমাদের কোন লালচ নেই। না আসলেও ক্লেশ নেই। ভাই লোক চলো, আমরা স্বদেশভূমি চম্পক নগর ফিরে যাই। নইলে এখানে উভয় সংকট। ঘরে থাকলে মগেরা কাটে মারে। বনে আত্মগোপনে গেলেও বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ খোয়াতে হয়। এই বিপদ আর কাম্য নয়।

আরাকান থেকে চাকমাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ ধরেই তারা প্রথমে এংক্ষ্যং ও আলীকদমের তৈনছড়িতে জমায়েত হতে থাকে। লক্ষ্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হলেও সেই সুদূর অতীতের চম্পক নগরের সঠিক ঠিকানা তারা ভুলে গিয়েছে। কোথায় যাবে? এই বিভ্রান্তির ভিতর স্থানীয় মুসলিম সামন্তদের সহানুভূতি ও সহায়তায় তারা মাতামুহুরী উপত্যকাকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে বসবাস করতে থাকে। এটাই হয়ে যায় তাদের নতুন স্বরাজ্য। তাদের দলপতি রাজারাও আচার-ব্যবহার ও রক্ত সম্পর্কে স্থানীয় মুসলিম সামন্তদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। শুরু হয় যায় মিশ্র

সামাজিকতা। এই মিশ্র সামাজিকতারই ফল হলো, অভিজাত চাকমাদের মুসলমানী নাম খেতাব ধারণ, মুসলিম গৃহকোণের ভাষা ও আচার-আচরণের অভ্যাস, ও খান্দানী আড়ম্বর প্রীতি। এতেই চাকমা মহিলারা হয়ে গেলেন বিবি। বি হলো তার অপভ্রংশ।এই মিশ্র সামাজিতার বিরুদ্ধে ধর্ম প্রতিবন্ধক হয়ে থাকতে পারেনি। বাঙালী মুসলমান আর চাকমাদের বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তানেরাই পরবর্তীতে মিশ্র ভাষা, নাম ও পদবির অধিকারী হোন। ফার্সি শব্দ খেশ এর বহুবচন খেঁশা, মানে আত্মীয়। মগ বংশজাত মুসলিম সন্তানদের চট্টগ্রামীরা বলেন জেরবাদী। এমনি চাকমাজাত মিশ্র সন্তানেরা হলো খিসা। এছাড়া উক্ত শব্দটির চাকমা ভাষায় পৃথক কোন অর্থ হয় না। এ ছাড়া মুসলিম গৃহকোণের ভাষা, আচার-আচরণ, চাকমা সমাজে সংক্রমিত হতে পারে না। এ হেতু চাকমা ও চট্টগ্রামী বাঙালী মুসলমানেরা পরস্পরের রক্তের শরীক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। চট্টগ্রামী মুসলমানদের বহুজনের রং ও গঠনে মঙ্গোলীয় প্রভাব থাকার এটাই প্রধান কারণ। চাকমা রাজা ধারা মিয়ার মোগল মহিলা বিবাহের কাহিনীটি এই অর্থে একেবারে ফেলনা নয়। চাকমা অভিজাত মহিলাদের পর্দা পালন ও কবর দান রীতিটিও মিশ্র বিবাহজাত প্রভাবের ফল বলে ভাবা যায়।

৩) তৈনছড়িকে স্থানীয়ভাবে আজকাল তৈনখাল বলা হয়। কিছু তঞ্চঙ্গ্যা শাখাভুক্ত চাকমা এখানে বাস করে। সংখ্যার হিসাবে প্রথম সম্প্রদায় হলো বাঙালী, তৎপর মুরুং ও অন্যান্যরা। আলীকদম থানার জনসংখ্যার হিসাবে পরে তা প্রদর্শিত হবে।

আলীকদমে মাতামুহুরী নদীর উত্তর কূল ঘেঁষে একটি রহস্যময় টিলা আছে, তার নাম আলীর পাহাড়। এর ভিতরকার হরিণ ঝিরি নামীয় খাদটিকে সামনে রেখে কয়েকটি সুড়ঙ্গ ও তার শাখা-প্রশাখা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থানীয় লোকদের ধারণা এটি হলো প্রাচীন যোদ্ধা বা কোন সামন্তের আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম গুহা। সুড়ঙ্গের কোন কোনটি এঁকে বেঁকে দূরে পাহাড়ের অপর প্রান্তে অন্য ঝিরি বা খাদে বেরিয়ে গেছে। কোন কোনটি মাটি পড়ে বন্ধ। স্থানীয় সাংবাদিক স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামান, উচ্চত মনি চাকমা গয়রো, ঝুঁকি নিয়ে সুড়ঙ্গ অভিযান করে মাত্র একটি সুড়ঙ্গেরই অপর প্রান্তের ঝিরিতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অক্সিজেন, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি ও অনুসন্ধানী টর্চের অভাবে তাদের পক্ষে অভিযানটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। উপরের দিকে এরূপ আরো সুড়ঙ্গ আছে বলে তাদের জবানে শোনা গেলো। এ পর্যন্ত কোন ধ্বংসাবশেষ দ্রষ্টব্য হলো না। তবে জানা যায়, উজানের দিকে মাতামুহুরী উৎস অঞ্চলে পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও পাকা ঘাটবাধা একটি দীঘি আছে। এলাকাটি দুর্গম, আর আরাকানী বিদ্রোহী উপদ্রুত। যাতায়াত ও অনুসন্ধান, বিপজ্জনক এবং কস্টসাধ্য। এ মুহূর্তে সে অভিযান থেকে বিরত থাকলাম।

আমার উৎসাহ হলো আলীর পাহাড় নিয়ে। এই প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে কি করে

আলীর পাহাড় নামকরণ হলো? এ নামটি অবিকৃত থাকলোই বা কি করে? এর সাথে সঙ্গতিশীল আঞ্চলিক নাম হলো আলীকদম। যদিও মঘী উচ্চারণে তাদের কেউকেউ এটি বিকৃত উচ্চারণে বলে আলেহক্যাডং। আরাকানী ভাষায় স্থানীয় অনেক পাহাড় ও জায়গার নামে ডং বা দং উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ কেওক্রাডং, মেরেইন ডং ইত্যাদি। সম্ভবত ডং মানে পাহাড়। তাই আলীর পাহাড়ই মঘী ভাষায় আলেহ ডং। তা থেকে আলেহ কেডং বা খেধং বিকৃতি।

এই অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন মানচিত্র, যা পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজ কর্তৃক ১৫৫০ খ্রীঃ সালে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে এতদাঞ্চলকে লোভাস দোকাম নামে অভিহিত করা হয়েছে। তা আলী কদমেরই পর্তুগীজ ভাষ্য, আলেহক্যাডং এর নয়। আলীকদম নামের মঘী উচ্চারণে আলেহক্যাডং হয়ে যাওয়া ও সম্ভব। মঘী ভাষায় এর বিভিন্ন অর্থ করা কষ্ট কল্পনা মাত্র। আলীর পাহাড় আর আলীকদম উভয় নামই মুসলিম ঐতিহ্যমন্ডিত।

বাস্তবেও এতদাঞ্চল প্রাচীন মুসলিম অধিকৃত এলাকা। বিস্মৃত হলেও এখানকার প্রাচীন মুসলিম আধিপত্য, অল্প বিস্তর ইতিহাসে বিধৃত আছে। দেখা যায়, আরকানের রাজা ইঙ্গ চন্দ্র ৯৫৩ সালে জনৈক সুরতানকে তাড়া করে চট্টগ্রামের দিকে অভিযান করেছেন এবং তাতে কুমিরার কাওনিয়া ছড়া পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল তার দখলিভুত হয়েছে। সুরতান আরবী সুলতান শব্দেরই মঘী বিকৃতি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো রাজা। এটাই প্রমাণঃ বাংলায় মুসলিম সুলতানী আমল শুরু হওয়ায় প্রায় তিন শত বছর আগে, দক্ষিণ চট্টগ্রামে মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। তৎপর ১৩৩৯/৪০ সালে সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ প্রথম এই অঞ্চল বাংলা সুলতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৪০৬ খ্রীঃ সালে আরাকানের রাজা নরমিখলা, বর্মী রাজা কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হোন। তিনি বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৬ বছর পর ১৪৩২ খ্রীঃ সালে সুলতান জালাল উদ্দীনের সহায়তায় তিনি স্বরাজ্য পুনর্দখল করেন। সেই অভিযানকালে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন বিজাতীয় শাসন থাকলে নির্বিবাদে তা ডিঙ্গিয়ে আরাকান দখল সম্ভব হতো না। রাজ্য পরিচালনায় তখন মুসলিম আমলাদেরও নিযুক্ত করা হয়। ওদের সঙ্গীসাথী হয়ে আরাকানে ভাগ্যান্বেষী সাধারণ বাঙালীরাও বিপুল সংখ্যায় ভীড় জমায়। এই প্রভাবে গোটা দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সীমান্তবর্তী শঙ্খ, মাতামুহুরী ও নাফ নদী উপত্যকা হয়ে পড়ে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত। পরে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রীঃ সালে গোটা চট্টগ্রাম নিজ দখলে আনেন। খোদা বখশ ছিলেন তার অধীন দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক। এই প্রশাসনিক এলাকার সদর দপ্তর ছিলো আলীকদম। মিঃ বারোজের মানচিত্রে এই আলীকদম রাজ্য ও খোদা বখশ খানের শাসনের কথা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

আমি উপজাতীয় বুড়াবুড়ি সুত্রে অবগত হই যে, আলীকদমে কিছু বিলীয়মান

ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীন প্রশাসনিক সদর দপ্তর হওয়ার সুত্রে এখানে ইমারতাদি নির্মিত হওয়াও সম্ভব ছিলো। তাই প্রথম সুযোগেই কথিত চাকমা পাগলা রাজার ভিটাটি পরীক্ষা করলাম। কিন্তু একটি জলাশয় ছাড়া অন্য কোন ইমারতেরই চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় উপজাতীয় লোকেরাও তার কোন হদিস দিতে পারলেন না।

স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামানের মৌখিক জানলাম, নদীর বিপরীত তীরে নোয়াপাড়া এলাকায় প্রাচীনকালের ইট দৃষ্টিগোচর হয়। তারই সন্ধানে নদী পার হয়ে নোয়াপাড়া গেলাম।

নোয়াপাড়া হলো আলীর পাহাড়ের বিপরীতে নদী বাঁকের দক্ষিণ পারের একটি বসতি। এখানে মগ ও বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। অতীত স্মৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার লক্ষ্যে দেখা করলাম স্থানীয় অশীতিপর বৃদ্ধ জনৈক মগ কারবারীর সাথে। তিনি বললেন ঃ ছোটবেলা অন্য জায়গা থেকে এ পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন। আগে তাদের বসতি ছিলো খানেক দূরের অন্য পাড়ায়। বাপ দাদার সুত্রে জানেন, এ পাড়ায়ই প্রাচীনকালে দুটি জমিদার বাড়ী ছিলো। তারা বাঙালী না পাহাড়ী ছিলেন, সে কথা তার মনে নেই। তবে তাদের বাড়ি ভিটার ইট খুলে তিনি নিজেও এই পাড়ামুখী রাস্তায় বিছিয়েছেন, যা এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৪) বৃদ্ধ মগ কারবারীর তথ্যানুযায়ী আমরা রাস্তা খুঁড়ে এক টুকরা প্রাচীন ইট পেলাম। তার গঠন প্রণালীতে মনে হলো এটি প্রাচীন আমলের ইট। লম্বায় ইটখানা আস্ত বলে মনে হলো না। তবে পুরু দেড় ইঞ্চি মাত্র, আর পাশে সাড়ে চার ইঞ্চি। পাশের মাপ অনুযায়ী লম্বায় ইটটি তার দ্বিগুণ অর্থাৎ নয় ইঞ্চি হওয়ারই কথা। কারণ গাথুনীতে লম্বার আড়াআড়ি দুটি ইটই খাটে। অথচ প্রাপ্ত ইটখানা লম্বায় মাত্র গড়ে সাত ইঞ্চি। ভাঙ্গার চিহ্ন পরিষ্কার না হলেও তার ব্যবহারিক পরিমাপ নয় ইঞ্চি লম্বা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, ইটটি লম্বায় আস্ত নয়।

আমাদের অনুসন্ধানের দ্বিতীয় স্থান হলো একটি পরিত্যক্ত স্তুপ। এটি একটি বাঙালী বাড়িতে অবস্থিত। বাড়ির মালিকেরা বললো, এখানে পুরাতন একটি ইটের ভাটা ছিলো। এখানে ভাঙা ইটের স্তুপ হাজামজা অবস্থায় থাকলেও গোটা কোন ইট বাহির করা সম্ভব হলো না। তবে টুকরা হলেও তা দুই ইঞ্চি পুরু বলেই মাপে পাওয়া গেলো। দৈর্ঘ্য প্রস্থ সন্দেহজনক থেকে গেলো। কামরুজ্জামান দু'খন্ড ইট একত্রে বসিয়ে একটি গোটা ইটের আনুমানিক নমুনা সাজালেন। কিন্তু আমার মনে হলো, এই নমুনার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সাড়ে আট ইঞ্চি ও সাড়ে এগারো ইঞ্চি হওয়াটা অস্বাভাবিক। প্রস্থের দ্বিগুণকে দৈর্ঘ্য ধরা হলে, এই মাপটিকে স্বাভাবিক জ্ঞান করা যায় না। তবে দুই ইঞ্চি পুরু হওয়াটা তাৎপর্যপুর্ণ। এই দুই ইঞ্চি পুরুত্বের ইট প্রমাণ করে, দুই প্রাচীন সভ্যতা এখানে কার্যকরী ছিলো। ইউরোপিয়দের প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্মাণ স্মারক হলো ৩×৫×১০ ইঞ্চি পরিমাপের ইট। তার পুর্বেকার মুসলিম আমলের ইট ছিলো দেড় ইঞ্চি পুরু, যা বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনায় এখনো দৃশ্যমান।

তবে দু'ইঞ্চি পুরু ইট, হিন্দু, বৌদ্ধ বা মগ আমলের হতে পারে। বর্ণিত বৃদ্ধ কারবারীর ভাষ্য অনুযায়ী এখানে একটি জাদি বা মঠ ছিলো। তারই ইট হয়তো এটি।

মোট কথা, বর্ণিত নির্মাণ সামগ্রীর অবস্থান গুণেই ভাবা যায় আলীকদম ছিলো একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ বসতি বা প্রশাসনিক অঞ্চল। আলীকদম নাম মুসলিম আমলের। তবে আসল প্রাচীন নাম হয়তো অন্য কিছু। তৈনছড়ি নাম সুত্রে ভাবা যায়, এলাকাটি অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিলো। তারা চাকমা অথবা বাঙালীও হতে পারে। হতে পারে এতদোভয়ের দ্বারা গঠিত মিশ্র সমাজের লোক। মগও অন্যান্য পাহাড়ী লোকের অধিবাসও এখানে ছিলো। তাই আরাকানী ভাষায় স্থানীয় অনেক জায়গাও পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে। তবে এই অঞ্চলে খোদা বখশ খান ও তার বংশধরেরা এবং তার পূর্বে আরো মুসলিম সমন্তেরা যেমন আধিপত্য চালিয়েছেন, তেমনি আধিপত্য করেছেন রোসাং রাজপুরুষ, আর চাকমা দলপতিরাও। সম্ভবতঃ এখানকার মুসলিম সামন্তেরা রোসাং রাজকীয় আধিপত্য মেনে নির্বিরোধ থাকতেন এবং চাকমা জনগোষ্ঠী ও দলপতিরা ছিলেন তাদের মিত্র ও স্বজন। মুসলিম নাম খেতাব ও ইসলামী পরিভাষা সমৃদ্ধ চাকমা ঐতিহ্যই প্রমাণ, এই দুই সমাজ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রাজনৈতিক লক্ষ্যে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ ও মগদের বিরুদ্ধ পক্ষ। চাকমা রাজপুরুষ ও বাঙালী সর্দাররাই ছিলেন সে ঐক্যের সুত্র। খিসা জনগোষ্ঠী আসলে মুসলিম বাঙালী ছিলেন ও পরে চাকমায় পরিণত হয়েছেন। না হলে খতনা করাও দাড়ি রাখার মত মুসলিম চরিত্র আর সর্দার পদবি চাকমা সমাজে আত্মস্থ হতে পারে না। এ জন্যই চাকমা গোত্রীয় নাম চেককাবা, দাজ্যা, সর্দায্যা ইত্যাদিতে মুসলিম পরিচয় সুপ্ত আছে।

আলীর পাহাড় নামটি বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ আলী নামীয় কেউ এই পাহাড়টি আবাদ করেছিলেন, যার এই গোটা অঞ্চলের উপর সামন্ত আধিপত্য ছিলো।

ইটখোলা বা ইটভাটা রূপে প্রদর্শিত স্তুপটির দক্ষিণ পশ্চিমে পুস্করিণীয় মত একটি ডোবা আছে। তার কোন পার নেই। তদ্বারা বুঝা যায়, এটি হয়তো ইটের মাটির গর্ত। পুস্করিণী হলে পার বাধা থাকতো। এই অঞ্চলে সাতটি পুস্করিণী আছে। অন্যান্য যেগুলো দেখেছি সেগুলোতে পারের চিহ্ন বিদ্যমান।

তৈন বা তিন সুরেশ্বরী নামীয় চাকমা রাজার ছেলে-মেয়েদের নাম হলো : (১) জানু (২) রাজেম বি ও (৩) সাজেম বি। বি হলো বিবি শব্দের অপভ্রংশ, যা মুসলিম মহিলাদের ব্যবহার্য পদবি। সাজেম ও রাজেম শব্দ বি যোগে মুসলিম স্ত্রী বাচক। এ হিসাবে জানু নামটিও পুরুষ বাচক মুসলিম জাহান বা জান এর বিকৃতি, বা ডাক নামই হবে। তাদের পিতার নামও এই মুসলিম ঐতিহ্যানুগ তৈন শের আলী হওয়া সম্ভব। ঐ তৈন শের আলীর নামে নদী পারের পাহাড়টির নাম আলীর পাহাড় হওয়া অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন তৈন অঞ্চলের প্রধান এবং তার পুত্র পৌত্ররাও

ছিলেন উত্তরাধিকার সুত্রে এই অঞ্চলের অধিবাসী চাকমাদের রাজা। উত্তর আরাকানের মইসাগিরি থেকে বিতাড়িত চাকমা ও তাদের কথিত রাজাদের এই অঞ্চলে পুনর্বাসন গ্রহণ সুত্রে তৈনছড়ী সহ, মাতামুহরী ও বাঘখালি পারের ১২টি গ্রাম চাকমা অধ্যুষিত হয়। সম্ভবতঃ সে সময় ছিলো, স্থানীয় সামন্ত খোদা বখশ খানের বংশধরনের আমল।

আলীর পাহাড়ে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ থাকায়, ভাবা যায়, পাহাড়টিতে হয়তো বাড়িঘর ছিলো। এই বাড়ি ঘর নির্মাণে নদী পারের নোয়াপাড়া সমতলে ইট পোড়ান সম্ভব। মনে হয় খোদা বখশ খান বা তার বংশধরেরা প্রশাসনিক দপ্তর, আবাসিক গৃহ ও দুর্গাদি নির্মাণে ইট ব্যবহার করেছেন। তাদের আলী নামীয় কারো নামে পাহাড়টি পরিচিত হতেও পারে। উভয় সম্ভাবনা এখানে পাশাপাশি মান্য।

এই নদী-উপত্যকা বাহী পথটি, আরাকান ও বার্মার সাথে যোগাযোগের জন্য প্রাচীনকালে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, এখনো তেমনি ব্যবহারযোগ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আর হাল আমলে সৈন্য চলাচল ও শরণার্থী যাতায়াতেও এ পথটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

৫) আলীকদম প্রেসক্লাবে বসে স্নেহাস্পদ উচ্চত মনি তঞ্চঙ্গ্যা ও কামরুজ্জামানের মুখে অত্যন্ত বিস্ময়কর দুটি কাহিনী শুনলাম, একটি শ্রুতি কথা হলেও অন্যটি বাস্তব।

শ্রুতিকথা হলো ঃ মাতামুহুরী নদী তীরবর্তী বনে কর্মরত একদল কাঠুরে নদীর চরে নির্মিত তাদের একচালা ঝুপড়িতে বিশ্রাম নেয়া কালে একজন জটাধারী উলঙ্গ লোক হঠাৎ এসে আবির্ভুত হয়। কাঠুরেরা ভয়ে আত্মরর্ক্ষাথে তার প্রতি তেড়ে আসে। তাতে লোকটি করুণভাবে হাত জোড় করে বলেঃ ওহে ভাইরা আমাকে মেরো না। আমি জিন-ভূত, পাগল বা দস্যু নই। আমি এক বিপন্ন লোক। আমাকে আশ্রয় দাও, এবং আমার ঘটনাটি শুনো।

লোকটির এই করুণ আহ্বানে কাঠুরে লোকেরা সংযত হয়ে তাকে আশ্রয় দিলো। তৎপর সে বলতে শুরু করলো নিজের কাহিনী। উৎসুক কাঠুরেদের গোল বেষ্টনীতে নিশ্চিন্তে বসে সে আদ্যপ্রান্ত বলে চললোঃ

কয়েক বছর আগে আমিও এক কাঠুরে দলের সদস্য হিসাবে এই এলাকায় বাঁশ কাঠতে এসেছিলাম। আমার নাম অমুক। আমার বাপের নাম অমুক। আমি অমুক পাড়া এলাকার বাসিন্দা। আমার সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনেরা হয়তো এ বলে প্রবোধ পেয়েছে যে, আমাকে হিংস্র বাঘ বা ভল্লুক ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু না, আমি এক ডাইনীর কবলে পড়েছিলাম। পাহাড়ের ভিতর একা বাঁশ কাটছি। অমনি এক তাকড়া সুন্দরী মহিলা এসে আমার সামনে উপস্থিত। লতাপাতায় কোনমতে লজ্জাস্থান ঢাকা। বাকি সারা শরীর উদোম। পরিপূর্ণ যৌবনা, স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বল রং মহিলাটি

নিঃশব্দে হাসিমুখে এক গোছা বন্য ফুল এগিয়ে দিয়ে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। আমি ভয় ভীতিতে বিহ্বল। ভাবছি একি পরী, দেবী, না বন মানবী? আমার দেখা-জানা স্থানীয় পাহাড়ী মেয়েরা তো রং গঠন ও বেশ ভুষার এরূপ নয়। সে নীরবে আমাকে হাত ইশারায় এগুবার কথা বললো। আমিও ভাবলাম, দেখি না রহস্যটা কী? এগুতে এগুতে সে আমাকে নিয়ে গেলো এক সংকীর্ণ পাহাড়ী গুহায়। ঢুকতে আমার ভয় হওয়ায়, সে আমাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে টেনে টেনে এগুলো। মুখ সংকীর্ণ হলেও, ভিতর বাসোপযোগী চওড়া। সে থেকে শুরু হলো মেয়েটির সাথে আমার একত্রে বসবাস ও বন্দী জীবন। সে আমাকে গুহা থেকে বেরোতে দেয় না, এবং খাদ্য সংগ্রহে যাবার সময় গুহামুখে এক বিরাট পাথর চাপা দিয়ে রেখে যায়, যেটি ঠেলে সরানো আমার শক্তিতে কুলায় না। সে আমাকে পাহাড় থেকে বন্য খাদ্যবস্তু এনে খেতে দেয়। অনভ্যস্ত হলেও, ক্ষুধার জ্বালায় সে সব খেতে আমি বাধ্য হই। একত্রে বসবাসের কারণে তার সাথে আমার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে সে গর্ভবর্তী হয় ও একটি সন্তান লাভ করে।

ইতিমধ্যে আমি মুক্তির আশা ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিন ছেলেকে নিয়ে কাটাই আর সে পাহাড় বনে খাদ্যের সন্ধানে চলে যায়। অনেক সময় ফলমূল পাওয়া যায় না। তখন সে মৃত পশুপাখী ও তাদের পরিত্যক্ত নাড়ি-ভূড়ি নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে আমি সে সব খেতেও অভ্যস্ত হয়ে যাই।

একদিন লক্ষ্য করলাম ঃ গুহার ভিতর পর্যাপ্ত আলো। কারণ খুঁজতে বেরিয়ে দেখি, গুহার মুখে পাথর চাপা নেই। ভাবলাম মেয়েটি হয়তো বেখেয়ালে বা ভুলবশতঃ পাথর চাপা দেয়নি, অথবা আমার পালানোর নিশ্চেষ্টতা এবং সন্তানের পিতৃত্বে আমার প্রতি তার আস্থা বেড়ে গেছে। আমি মুহুর্ত দেরী না করে এই সুযোগটিকে কাজে লাগালাম। হামাগুড়ি দিয়ে গুহা মুখ উত্তীর্ণ হয়েই দিলাম প্রাণপণ ছুট। ভাবলাম ঃ ডাইনীটি দুপুরে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে ফিরবার আগে আমাকে নিরাপদ দূরে পালিয়ে যেতে হবে। দৌড়াতে দৌড়াতে এই তোমাদের দেখা। এখন আমার আশ্রয় ও বিশ্রামের দরকার। ডাইনীটি খুঁজে পেতে সক্ষম হলেও, এতজন মানুষের মাঝে আক্রমণ করার সাহস পাবে না।

আমি মহিলাটির পরিচয় জানতে পারিনি। আমরা কেউ পরস্পরের ভাষা বুঝতাম না। ইশারা, ইঙ্গিত, হ্যাঁ, হু ইত্যাদিতে তার আমার ভাব আদান প্রদান হতো।

খাওয়া-দাওয়া শেষে বিশ্রামের এক পর্যায়ে, এক পাহলোয়ান উলঙ্গ যুবতী মেয়ে, একটি বাচ্চা কোলে হঠাৎ ঝুপড়িটির সামনে এসে উপস্থিত। তার দৃষ্টিও চেহারায় রাগ ও হিংস্রতার প্রকাশ। দুর্বোধ্য ভাষায় বাচ্চাটিকে দেখিয়ে চিৎকার দিয়ে কি যেন প্রতিবাদ ও ক্ষোভের কথা জানালো। মনে হলো লোকটাকে পারলে ধরে নেয়। ততক্ষণে কাঠুরেরা লাঠিসোটা ও দা-কুড়াল নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েটি অনেকক্ষণ নিরুপায় আস্ফালন ও আহাজারি করলো। শেষে বুঝলো,

লোকটাকে আর পাওয়ার আশা নেই। সেও তাকে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝালো, আর ফিরে যাবে না। নিরুপায় মেয়েটি কিছুক্ষণ বিলাপ করে গেলো। তৎপর হঠাৎ রাগে ও দুঃখে কোলের বাচ্চাটিকে এক টানে চিড়ে দ্বিখন্ডিত করে তার একটি খন্ড লোকটির দিকে ছুড়ে মেরে, অপর অংশকে বুকে জুড়িয়ে, হাউমাউ করে চিৎকার দিয়ে, পরিবেশকে ব্যথিত করে, বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলো। কাঠুরে দল এ দৃশ্যে কিংবর্তব্য বিমূঢ় ও ভয়ার্ত। মেয়েটির প্রতিশোধও অজানা আপদের আশংকায় তারা তখনই আস্তানা গোটাতে লেগে গেলো। শুরু হলো তাদের বাড়িমুখী পশ্চাদপদ যাত্রা। সঙ্গে ঐ হতভাগ্য লোকটি।

দ্বিতীয় ঘটনাটিকে গল্প বলা যাবে না। তার ভুক্তভোগী লোকটি এখনো জীবিত, আর এতদাঞ্চলেই আছে। ঘটনাটি স্নেহভাজন উচ্চতমনি ও কামরুজ্জামানের দ্বারা পরীক্ষিতও বটে। এটি যুক্তির বিচারে অবিশ্বাস্য, তবে প্রত্যক্ষিত বাস্তব বলে উল্লেখযোগ্য। আমি ঘটনাটিকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এবং উপরোক্ত দুই স্নেহভাজনকেও উপেক্ষা করতে অক্ষম। ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে আরো অনুসন্ধান দরকার বলে মনে করি।

৬) ঘটনাটি হলো ঃ লামার একটি বাঙালী পাড়ায় বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছে, আলী কদম অঞ্চলের জনৈক মুসলিম যুবক। যাবার সময় বোন ও ভগ্নিপতির কাছে সে আব্দার জানায়, ভাগ্নিটিকে দাও, কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে আসবে। মেয়েটির মা-বাবা ভাবলেন আপন মামা। আব্দার করছে। মেয়েটিও নানা বাড়ি যেতে আগ্রহী, আচ্ছা যাক, আপত্তির কি আছে। মামা-ভাগ্নিকে লামার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিলেন তারা। বললেন ঃ কিছুদিন পর দিয়ে যেয়ো। আনতে যেতে পারবো না। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত আছি। মেয়েটির সম্পর্কের জন্য কিছু কিছু আলাপও আছে। দেরী করো না।

কিন্তু বেশ কিছু দিন হলো, মেয়েটির আসার কোন লক্ষণ নেই। ভাল-মন্দ খোঁজও নেই। চিন্তিত মা-বাপ।

এদিকে কাঠুরে আর রাখালেরা বলাবলি করছেঃ অমুক মেয়ের মত দেখতে অবিকল একটি যুবতী মেয়ে, অমুক গুহা মুখে বসে থাকতে প্রায়ই দেখা যায়। কাছে গেলে গুহার ভিতর আত্মগোপন করে। ঘটনাটি ভাবিয়ে তুলে ঐ মা-বাবাকে। তারা আলী কদম গিয়ে নানা বাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখেন মেয়েটি সেখানে নেই। ঐ বাড়ির সবাই মেয়েটির বেড়াতে আসার কথা অস্বীকার করেন। কথিত মামাটি তো ভগ্নির বাড়ি বেড়ানো ও ভাগ্নিকে নিয়ে আসার কথায় বিস্মিত। মহা ফাপরে পড়েন সবাই। এ কেমন করে সম্ভব? জলজ্যান্ত মামার সাথে ভাগ্নিকে দেয়া হলো। অথচ ঐ মামাই বলছে ঃ সে বোনের বাড়ি যায়নি, এবং ভাগ্নিকেও আনে নি। সে বাস্তবে মামা বাড়িতেও নেই, এবং লোকে বলে গুহামুখে তাকে দেখে। ব্যাপারটি কী? সারা অঞ্চল জুড়ে হুলস্থুল পড়ে যায়।

সিদ্ধান্ত হলো ঃ গুহামুখের ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করে দেখতে হবে, সে কে? জানতে হবে তার গুহাবাসের রহস্য। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা সে উদ্ধার অভিযানে গেলেন। দেখা গেলো ঃ সত্যই ঐ মেয়েটি গুহামুখে বসে আছে। দূর থেকে আত্মীয়দের ডাকাডাতিতে সে সাড়া দিলো না। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই সে আত্মগোপন করলো গুহার ভিতর। কিন্তু তাতে আত্মীয়রা দমিত হলেন না। সাহসের সাথে দু'একজন ভিতরে গেলেন, এবং মেয়েটাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গুহায় তখন অপর কেউ ছিলো না। উদ্ধারের পর মেয়েটির স্বাভাবিক হতে অনেক দিন লেগেছে। তৎপর তার বিয়ে হয়েছে। ঘর সংসার ও করছে। তবে ঘটনাটির ব্যাপারে সে হামেশাই চুপ। কোন জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না, ও কাউকে কিছু বলেও না। উচ্চত মনি আর কামরুজ্জামান ও মেয়েটির দেখা পেয়েছেন। তবে সাক্ষাৎ বর্ণনা দিতে তাকে কোন মতেই রাজি করান যায়নি। ঘটনাটি কেউ ভাবেন জিন ভুতের কান্ড, কেউ বলেন প্রেমঘটিত অত্যুক্তি ও প্রতারণা। কিন্তু মা বাপের কাছে জলজ্যান্ত মামার অভিনয় করাটা তো প্রেমিকের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই ব্যাপারটি রহস্যাবৃত। একমাত্র ভুক্তভোগী মেয়েটাই এই রহস্যোদঘাটনের সুত্র।

চাকমা লোকগাথা সুত্রে বর্ণিত হয়, মাতামুহুরী তীরের বারটি গ্রামেই তারা প্রথমে স্থানীয় মুসলিম অধিপতিদের আনুকূল্যে বসতি স্থাপন করেন। আরাকানের মইসাগিরিতে মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাকমা সমাজ ঐ অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হোন, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নিকটবর্তী বাংলা অঞ্চলের মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য তাদেরকে এতদাঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করে। বলা হয়ে থাকে ঃ তৈন সুরেশ্বরী, বা তৈন শের আলী ছিলেন এতদাঞ্চলীয় চাকমাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রধান।

প্রয়াত যামিনী রঞ্জন চাকমাকৃত চাকমা দর্পণ পুস্তিকা সুত্রে জানা যায়, ঐ প্রধানের নাম তৈন সুরেশ্বরী। তবে প্রয়াত রাজা ভুবন মোহন রায় স্বীয় পুস্তকঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসে সে নামটি তিন সুরেশ্বরী বলেই উল্লেখ করেছেন। তবে আমার মনে হয়, এ নামটি তৈন শের আলী থেকে বিকৃত। কারণ সুরেশ্বরী নামটি স্ত্রীবাচক এবং তার সাথে তিন যোগ অর্থহীন। একজন গর্বিত দলপতির অর্থহীন স্ত্রীবাচক নাম কোনমতেই মানানসই, ও কাম্য নয়। যেহেতু তিনি ছিলেন তৈন খাল বা তৈনছড়িবাসী চাকমাদের প্রধান, এবং তার কথিত আবাস এলাকাটি সম্ভবত আলীর পাহাড় নামে খ্যাত, এবং এতদাঞ্চলেরই আরেক সামন্ত চন্দন খানের তৈন খান উপাধি ধারনের উদাহরণ বিদ্যমান, সেহেতু আভিজাত্যের সাথে মানানসই নাম তিন সুরেশ্বরী নয়, প্রকৃতই তা তৈন শের আলী হওয়া সম্ভব।

তৈন খাল বা তৈনছড়ির আদি চাকমা বাসিন্দা হওয়ার সুত্রে একটি চাকমা গোত্রের নাম হলো তৈন্যা গোজা। তাতে অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলো হলো ঃ (১) কুজ্যা (২) উজ্যা (৩) কাম্যুয়া (৪) মুলিমা ও (৫) মেন্দর।

বিখ্যাত সাধক কবি শিবচরণ এই তৈনছড়িরই বাসিন্দা ছিলেন। প্রথমে তার বাসস্থান ছিলো রাজস্থলীর গারাওয়া নামক পাড়ায়। তবে সেখানে সংঘাত সংঘর্ষের কারণে তার পরিবার তৈনছড়িতে স্থানান্তরিত হয়ে যান। তিনি ছিলেন অকৃতদ্বার। তার রচিত গীতিকাব্য ঃ গজেনোর লামা হলো প্রাচীন চাকমা রচনার অন্যতম নির্দশন। রচনাটি সমৃদ্ধ ভাষা ও উচ্চতর ভাবমন্ডিত। চাকমা সমাজে এটি ভক্তি সহকারে পঠিত ও গীত হয়। তার সময়কাল হলো ১১৮৪ মঘী সন, মোতাবেক ১৮২২ খ্রীঃ। কারণ তার রচনার ৬ষ্ঠ লামায় ব্যক্ত দুই ভিন্ন উক্তি সমৃদ্ধ পংতি সঠিক তথ্য ব্যক্ত করে না। উক্তিদ্বয় লিপিকারদের সৃষ্টি, মূল ভাষ্য নয়। একটাতে উল্লেখিত হয়েছেঃ ১১ হাজার ৮৪সন জন্মিলো বুধবার শিবচরণ। অন্যটিতে আছে ১ হাজার ৮৪ সন জন্মিলো বুধবার শিবচরণ। বিভিন্ন তা হলো ১ হাজার আর ১১ হাজার বক্তব্যে। এই স্থলে আমার উদঘাটন হলোঃ মূল বক্তব্য হবে ১১ আর ৮৪ সন। মগী পঞ্জিকা ধরে তা হয় ১১শ ৮৪ সমান ১৮২২ খ্রীঃ সন। এই স্থলে হাজার শব্দের পরিবর্তে আর শব্দ যোগ হবে। কারণ ১১ হাজার বছরের প্রাচীন কোন পুঞ্জীকা বাস্তবে নেই। দ্বিতীয় বক্তব্যটি ও সঠিক নয়, কারণ তাতে এসনটি হয় ১৭২২ খ্রীঃ, যা ইতিহাস সমর্থন করে না। ডঃ আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন উদঘাটিত মতে রাজস্থলী ও তার আশপাশে শের মস্ত খানের মাধ্যমে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালের পর প্রথম চাকমা বসতি স্থাপিত হয়েছে। শিবচরণের জন্মস্থান হতে হলে, রাজস্থলীতে তার জন্মকাল ১৮২২ খ্রীঃ ই হবে, ১৭২২ খ্রীঃ নয়। শ্রদ্ধেয় যামিনী বাবুর এই ১৭২২ বক্তব্যটি ভুল।

৭। আমার অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় হলো মুরুং নেতা বাবু মেনলের সাথে সাক্ষাৎ।

এই আলীকদম সদরেই তার বর্তমান বাসস্থান। তিনি বান্দরবন স্থানীয় সরকার পরিষদের ভূত পূর্ব সদস্য ও বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধকারী মুরুং বাহিনীর সংগঠক ও কমান্ডার। শান্তিবাহিনীর গুলিতে একপা হারিয়ে পঙ্গু। তবে নিঃসন্দেহে এক সাহসী পুরুষ।

শান্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ ও তার পা হারানোর কাহিনীটি দুঃসাহসী কান্ড। পড়ন্ত বিকেল বেলা ফিরতি পথে বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত তার বাসাতেই, আমাদের উভয়ের মাঝে স্নেহাস্পদ কামরুজ্জামাননের মাধ্যমে অল্পক্ষণের আলাপ পরিচয়। তিনি বর্ণনা দিলেন ঃ

শান্তিবাহিনীর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে শঙ্খ উজানের থানচির বাসস্থান ছেড়ে ১৯৮৩ সালে মাতামুহুরী উজানের এই আলীকদম অঞ্চলে চলে এলাম। ধারণা ছিলো ঃ এখানে শান্তি পাবো। স্বজাতীয় মুরুংদের প্রধান আবাসস্থল এই আলী কদম। এখানে আমাদের জনবল আছে। শান্তিবাহিনীর উৎপাত অসহ্য হলে, প্রতিরোধ করাও যাবে। কিন্তু আমার ধারণা মত এখানেও শান্তি ছিলো না। শান্তিবাহিনীর উৎপাতে

মুরুংসহ সবাই অতিষ্ঠ ।হলো। স্বজন-পরিজন ও স্বজাতীয়দের সাথে মত বিনিময় শুরু করলাম। মুখ বুজে এভাবে কত সহ্য করা যায়? বুঝতে পারলাম প্রতিরোধের পক্ষে সাহসী ভূমিকা নিতে অনেকেই প্রস্তুত। কেবল সাংগঠনিক উদ্যোগ দরকার।

আমি লামায় স্বচক্ষে দেখেছি ঃ পোপার তুকরাং নামীয় এক মুরুং কারবারীকে, শান্তিবাহিনীর ধার্যকৃত মালামাল পৌঁছে দিতে দেরী করায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। থানচিতে আমি দেখেছিঃ কাপিতাং নামীয় জনৈক বাঙ্গালী বেপারীকে দিয়ে কবর খুড়িয়ে, তাকে মেরে, ঐ কবরেই মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। তৎপর এই আলীকদমেরই মাতামুহুরী রিজার্ভের মেংরা কারবারী পাড়ার হতভাগিনী কম্পং মুরুংনীকে গর্ভবর্তী অবস্থায় হত্যা করে। তার পেট কেটে জীবন্ত শিশুটিকেও টুকরা টুকরা করে কেটে উল্লাস করেছে শান্তিবাহিনীর নরাধমেরা। আর সহ্য হচ্ছিলো না। আমি প্রতিরোধে বিশ্বস্ত সঙ্গী সাথী যোগাড়ে সচেষ্ট হলাম। প্রাথমিকভাবে সহযোগী পেলাম ৭ জন। শান্তিবাহিনী থেকে সদ্য প্রত্যাগত আরো ৪ জন আমাদের সাথে সহযোগীতায় সম্মত হলেন। শুরু হলো আমাদের শান্তিবাহিনী দমনের নিরস্ত্র অভিযান। ভাবলাম অস্ত্র দরকার। তবে তা শত্রু থেকেই কেড়ে নিতে হবে। অস্ত্র ছাড়া অস্ত্রধারীদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সে হলো ১৯৮৫ সাল। কাচিপিয়ার লোংরা পাড়ার ঝিন ঝিরিতে শান্তিবাহিনীর একটি আস্তানা ছিলো। আমরা গোপনে অনুসন্ধান করে, পথঘাট ও আক্রমণের সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে ওৎ পেতে থাকলাম। আমাদের অস্ত্র হলো দা, কুড়াল, লাঠি-সোটা ও একটি গাদা বন্দুক।

রাত শেষ প্রায়। অমনি ঝাপিয়ে পড়লাম শান্তিবাহিনীর ঐ আস্তানায়। গাদা-বন্দুকের আওয়াজ হতেই শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জেগে উঠে যে যেদিকে পারে দিলো ছুট। অল্পক্ষণে সবাই উধাও। আমাদের দখলে এসে গেলো আস্তানাটি। তাতে পাওয়া গেলো ১টি রাইফেল, ২টি এস এল, আর, ১টি এল এম জি আর ৭৫০ টি গুলি। আমাদের প্রাথমিক অস্ত্র ভান্ডার গড়ে উঠলো। এই সাফল্যে উৎসাহিত হলেন অনেকে। তাতে আমাদের সদস্য সংখ্যা ও বেড়ে গেলো।

অনুমান হলো ঃ উক্ত অভিযানকে শান্তিবাহিনী সেনা আক্রমণ বলেই মনে করেছিলো। কিন্তু পরে তারা নিশ্চিত হয় যে, মুরুংরাই এর হোতা। ফলে মুরুংদের উপর তাদের উৎপীড়ন বেড়ে যায়। এবং আমরাও তা প্রতিরোধে দৃঢ় সংকল্প হই। আমাদের এই অভিযান ও সাফল্যের কথা পরে সেনাবাহিনীর গোচরীভূত হয়, এবং তারা আমাদের প্রতি সহযোগীতা দান শুরু করে। আমরা কাচিপিয়া অভিযানে অস্ত্র ছাড়াও শান্তিবাহিনীর গুদামজাত প্রায় ৫/৬ হাজার মন ধান পেয়েছিলাম।

আমাদের দ্বিতীয় অভিযান ক্ষেত্র হলো মধুতে অবস্থিত শান্তিবাহিনীর আস্তানা। আমরা খবর পাই যে, সেখানে এতদাঞ্চলীয় শান্তিবাহিনীর সদস্যরা একটি মিটিং উপলক্ষে সমবেত হয়েছে। মুরুং বাহিনীর ৯৩ জন সদস্য নিয়ে আমি ঐ এলাকাটি ঘেরাও করে ফেলি। ফলে উভয় দলে সংঘর্ষ হয়। তাতে দুজন শান্তিবাহিনী সদস্য

মারা যায়, ও বাকিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবারও আমরা দুটি অস্ত্র হস্তগত করি।

এরপর মধু রেংক্রং পাড়ায় শান্তিবাহিনীর সাথে আমাদের তৃতীয় মোকাবেলা হয়। সেখানে আমি নিজে হাতে পায়ে ও মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হই। আমার দলের অপর একজন যোদ্ধা নিহত হয়। তবে শত্রুপক্ষে দুজন নিহত আর আহতের সংখ্যা অনেক।

আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য আমাকে চকোরিয়ার মালুমঘাটে অবস্থিত ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে আমার একটি পা কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে। এই কাটা পা-ই বিদ্রোহী ও অত্যাচারী শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং দেশ ও জাতির পক্ষে পরিচালিত আমার সশস্ত্র সংগ্রামের স্বাক্ষী। পঙ্গু হলেও এই কাটা পার জন্য আমি গর্বিত। তবে আমি অতৃপ্ত এ কারণে যে, শারীরিক অক্ষমতা আমাকে শান্তিবাহিনী দমনে অধিক এগুতে দেয়নি।

সরকার মুরুংদের অবমূল্যায়ন করছেন দেখে আমি দুঃখ পাই। চুক্তি অনুযায়ী সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে মুরুংদের নয়, তাদেরই ক্ষুদ্র শাখা সম্প্রদায় ম্রুদের উপজাতি ঘোষণা করেছেন। অথচ তারা সংখ্যায় শতের কোটায় সীমাবদ্ধ, আর আমরা ২২ হাজারের অধিক। এটা কি জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধ প্রভাবের ফল?

আমরা দেশপ্রেমিক ও বাংলাদেশী জাতির স্বপক্ষ। শান্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বউদ্যোগে পরিচালিত সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ রেখেছি। যদি প্রকৃত চরিত্রের ভিত্তিতে উপজাতি নির্ধারণ করা হয়, তা হলে অন্য অনেকের চেয়ে বাস্তব উপজাতি আমরাই। আমাদের সরাসরি উপজাতি স্বীকৃতি না দিয়ে, ম্রুদের দলে ব্রেকেটভুক্ত করা, সঠিক মূল্যায়ন নয়। সরকারের কাছে আমাদের আরো দাবী, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে দেয়া হোক। আমরা এখনো আদিম অনুন্নত মানুষ। একমাত্র জুম চাষ পেশাই আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়, যা আজকাল জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ও বিভিন্ন পেশাগত যোগ্যতা অর্জিত হলে, আমাদের আদিম জীবন-যাপন পদ্ধতি, ও জীবিকা নির্বাহে পরিবর্তন আসবে। তাই এখন আমাদের দরকার শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ। ফল-মূল গাছের বাগান চাষ সৃজন ও পশু পালনে আমাদের সহায়তা করা হলে, জুম নির্ভরতা কমবে। জুমে এখন আর যথেষ্ট ফল ফসল পাওয়া যায় না। বন জঙ্গল গাছপালা আর পশু পাখীর পক্ষেও তা ক্ষতিকর। বন, পশু, পাখী আমাদের সম্পদ।

বাবু মেনলের সাথে আলাপে মনে হলো ঃ অশিক্ষিত হলেও, তিনি একজন চেতনা সম্পন্ন মানুষ। নেতৃত্বের গুণও তার মাঝে আছে। দেখলাম তাকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে আলাপ ও আড্ডারত একদল মুরুং নারী-পুরুষ। নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে

বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শ নিতে এসেছে।

৮) কামরুজ্জামান ও উচ্চত মনি ছাড়াও অনেকের মুখে শুনলাম আরবীতে লেখা একটি পাথর খণ্ড এখানকার বন বিভাগীয় অফিস ঘাটে বহুদিন যাবৎ অবহেলা অবজ্ঞায় পড়ে ছিলো। শেষে কে বা কারা ঐ শিলা খণ্ডটিকে বাজার মসজিদের প্রাঙ্গনে নিয়ে রাখেন। পরে ঐ মসজিদটি পুনর্নির্মাণের সময় অসাবধানতা বশতঃ পাথরটি খোয়া যায় বা ভিটার ভিতর চাপা পড়ে যায় বলেই মনে হয়। এ কারণে বহুদিন যাবৎ পাথরটি গায়েব। কেউ তার সঠিক হদিস জানেন না।

আমার মনে হয় পাথরটি একটি মূল্যবান প্রত্ন নির্দশন রূপে, কিছু স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যের ধারক ছিলো। পুরাতন ইমারাতাদির গায় এরূপ বিভিন্ন তথ্য লিখিত পাথর এখনো দৃষ্টিগোচন হয়। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত শাহী জামে মসজিদের দেওয়ালে অনুরূপ তথ্য সম্বলিত পাথর স্থাপিত আছে। ওলি খাঁর মসজিদ ও নসরত খাঁর মসজিদও অনুরূপ পাথর ধারণ করে আছে। সিলেটের শাহ জালালের দরগায় বিভিন্ন লেখা সম্বলিত বেশ কিছু পাথর স্থাপিত আছে। ওগুলোতে নির্মাণ ও বিজয় বিবরণ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান পুরুষদের বর্ণনা সন তারিখসহ খোদাইকৃত পাওয়া যায়। অতীত ইতিহাসের পক্ষে এগুলো হলো মূল্যবান ও প্রামাণ্য সুত্র। পাথর খোদাই বিবরণ, ইমারতাদির গায় স্থাপন হলো প্রাচীন ভারতীয় মুসলিম ঐতিহ্য।

আলীকদমে দর্শনযোগ্য কোন প্রাচীন ইমারত এখন আর অবশিষ্ট নেই। বর্ণিত পাথরটি অজ্ঞাতে অবহেলায় খোয়া যাওয়ার মত প্রাচীন স্থাপনাগুলো যে মানুষের দ্বারাই ধ্বংস হয়ে গেছে, তা একরকম নিশ্চিত। প্রাচীন ইট সুরকি আর ইট ভাটাই প্রমাণ এতদাঞ্চলে পাকা ইমারতাদি ছিলো। খোদাই ও অনুসন্ধানের দ্বারা তার হদিস পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন বর্ণনা সম্বলিত পাথরটির কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের সাথে যুক্ত থাকা সম্ভব। এও সম্ভব যে, শুধু আলীকদম সম্বন্ধে নয়, আরো কিছু বর্ণনা তাতে ছিলো। পাথরটি প্রাচীন সুলতানী আমলের বর্ণনা সমৃদ্ধ আরবী হলে সে বর্ণনাটি হয়তো ঐতিহাসিক হতে পারে। প্রাচীন সুলতান ওরফে সুরতানদের আমল হলো প্রথম সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দী। ওদের দক্ষিণ চট্টগ্রামে আধিপত্য ছিলো, আরাকানী রাজা সুলত ইঙ্গ চন্দ্রের ৯৫৩ খ্রীঃ সালে চট্টগ্রামের দিকে জনৈক সুরতানকে বা সুলতানকে তাড়িয়ে যুদ্ধাভিযান করার কথা আরাকানী ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায়।

যদি পাথরটি পরবর্তী বাংলার সুলতানী বা মোগল আমলের হয়ে থাকে, তা হলেও তার ভাষা হবে সে আমলের সরকারী ফারসী। পাথরটি পাওয়া গেলে, সে মূল্যবান তথ্যটি অবগত হওয়া যেতো। দুর্ভাগ্য যে, পাথরটি অবজ্ঞা অবহেলার ফলে হারিয়ে গেছে। এটা এক অপূরণীয় ক্ষতি। পাথরটির বর্ণনার ভাষাই বলে দিতো এখানকার মুসলিম আধিপত্যের কালটি প্রথম সহস্রাব্দের সময়কার ছিলো কিনা। যদি তাই হতো তা হলে সেটি হতো স্থানীয় মুসলিম ইতিহাসে এক মূল্যবান সংযোজন।

এখানে আরো প্রত্ন নিদর্শন ও পুরাবস্তু পাওয়া সম্ভব। তজ্জন্য দরকার গভীর অনুসন্ধান ও ধ্বংসস্তুপ খোদাই। আমার আক্ষেপ যে, আমি এ কাজটির পক্ষে যোগ্য ও সঙ্গতিশীল ব্যক্তি নই। এই সাথে ভেবে দেখার দরকার যে, চাকমা রাজ পুরুষদের ব্যবহৃত সীলমোহরগুলো আরবী বর্ণ ও ভাষায় কী করে অলংকৃত হলো। এগুলোর দ্বিতীয় প্রাচীনতম সীলমোহরটি হলো জনৈক শের জব্বার খাঁর। ওাতে আরবী বর্ণ ভাষা ছাড়াও ইসলামী বিশ্বাসের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। রাধা মোহন ধনপতির পালায় আস্ত একটি আরবী বাক্যই স্থান করে নিয়েছে। যথা ঃ লবিয়ত সবিয়ত থুম। (আরবী তাম) মানে আদর আপ্যায়ন শেষ।

এটা কি প্রাচীন আরবী সুলতানী মুসলিম প্রভাব, যা ভাষা ও ধর্ম বিশ্বাসে চাকমা সমাজে সংক্রমিত?

এখানে এই সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা দরকার যে, চাকমারা কি এতদাঞ্চলের কোথাও, কোনরূপ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলো? তা হলে কখন এবং কোথায় সে রাজ্যটির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব?

এই ক্ষেত্রে চাকমাদের নিজস্ব উচ্ছ্বাসপুর্ণ বর্ননা ও দাবীর কথা ত্যাগ করে নিরপেক্ষ বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার। বিশ্ব ইতিহাসের পাতায়, বিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পাকারে হলেও, চাকমাদের কিছু বিবরণ অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই ক্ষেত্রে প্রথমেই বিবেচ্য হলো পর্তুগীজ পণ্ডিত জোয়াও ডে বারোজের বাংলার মানচিত্রটি, যা ১৫৫০ খ্রীঃ সালে অংকিত সর্ব প্রাচীন দলিল। বাংলার সামুদ্রিক উপকূল থেকে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল তাতে প্রদর্শিত হয়েছে। আধুনিক মানের বিচারে ঐ মানচিত্রটি সঠিক রেখায় অংকিত নয়। তাতে আনুষ্ঠানিক জরিপী তথ্য সন্নিবেশিত নেই। সে যুগে জরিপী ভূচিত্র অংকনের কৌশল উদ্ভাবিত হয়নি। নিজের দেখা, অন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, আর অনুমানের ভিত্তিতে, ভূচিত্র অংকন ছাড়া উপায় ছিলো না। বর্ণিত মানচিত্রে তাই নদী সমূহের গতি রেখা, স্থান সমূহের অবস্থান এবং দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা প্রদর্শনে হেরফের হয়েছে। এই সুক্ষ্ম দোষ ক্রটিগুলো সত্ত্বেও মানচিত্রটি একটি গুরুত্বপুর্ণ দলিল। ঐ মানচিত্রে ব্রহ্মদেশ রেইনো দে ব্রেমালিমা, আরাকান রেইনো দে আরাকাম এবং ত্রিপুরা রেইনো ডে টিপোরা নামে প্রদর্শিত হয়েছে।

দেখা যায় চাকোমা অঞ্চলের অবস্থানের পশ্চিমাংশ থেকে দুটি উপনদী উৎসারিত হয়ে অর্ধ বৃত্তাকারে পশ্চিমমুখী হয়ে কর্ণফুলিতে পতিত হয়েছে। স্থানটির উত্তর-পশ্চিমে ত্রিপুরা, দক্ষিণে আরাকান ও পূর্বে ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। এই বর্ণনার আলোকে বলা যায়, কর্ণফুলী নদীর প্রধান দুই উপনদী রাইংক্ষ্যং আর সুবলংই সে দুই উপনদী, যেগুলোর উৎস কেন্দ্র হলো, বার্মা সীমান্তের ভিতরকার ঐ পর্বত্য অঞ্চল, যেখানে কালাদেইন নদী উপত্যকা, আর চীন পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। ঐ এলাকাটি আরাকানের

উত্তর শেষাংশ এবং বার্মার পশ্চিম সীমান্ত ও বটে। বারোজের মানচিত্রটি ভাল করে পরীক্ষা করে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপ সাগরের উপকূল ঘেষেই রেইনো ডে আরাকাম অবস্থিত। এতদাঞ্চলের তিন নদী তথা শঙ্খ, মাতামুহুরী ও নাফের উপত্যকা অঞ্চল নিয়ে ইস্টাডো ডে লোভাস ডোকাম নামীয় এলাকাটিও পূর্বের পাহাড় থেকে পশ্চিমের সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলটির ভিতরই কোদা ভোস কাম নামটি মুদ্রিত। উক্ত লোভাস ডোকামের পূর্বে বর্ণিত দুই উপনদীর উৎস মুখে চাকোমা নামীয় অঞ্চলটি পড়ে। তাতে রেইনো বা ইসটাডো শব্দের প্রয়োগ নেই, যা রাজ্য ও রাষ্ট্র অর্থ জ্ঞাপক। সুতরাং চাকোমা নামীয় জায়গাটি এ নামের সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চল বলেই বুঝা যায়, কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাষ্ট্র নয়, এবং তা বার্মার সীমান্তভুক্ত এলাকাও বটে। 'কোদাভোস কাম' নামটি 'খোদা বখশ খান' বলে বুঝা যায়। মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে শঙ্খ থেকে নাফ নদী পর্যন্ত মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপত্যকা ও পূর্বের পর্বতাঞ্চলসহ 'লোভাস ডোকাম' বা আলীকদম নামীয় অঞ্চলটি খোদা বখশ খান বংশের দ্বারা শাসিত রাজ্য ছিলো। তারই পূর্ব-উত্তর সীমান্তে চাকোমা অঞ্চল, যা বার্মার ভৌগোলিক সীমানায় পড়ে। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা ও আরাকানের অবস্থানের দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, বর্ণিত চাকোমা অঞ্চলটি বাংলার অভ্যন্তরে অবস্থিত নয়। সুতরাং অঞ্চলটি চাকমা কথিত উত্তর আরাকানের মইসাগিরি বলেই অনুমিত হয়। মানচিত্রটিতে চাকমা চিহ্নিত বা অধ্যুষিত অঞ্চলটির স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হতে হলে, তার প্রতীক মুদ্রা ও আন্তঃ রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের প্রমাণাদির অধিকারী হতে হবে, যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৯) পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজের মানচিত্রে প্রদর্শিত লোভাস ডেকাম নামটির, মাতামুহুরী উজানের বহুল পরিচিত আলীকদমের পর্তুগীজ ভাষ্য হওয়াই সম্ভব। অনুরূপ সঙ্গতিপুর্ণ নামধারী কোন দ্বিতীয় জায়গা এতদাঞ্চলে নেই। কোদা ভোস কাম নামটিও খোদা বখশ খান বলে অনুমান করা যায়। যেহেতু ঐ মানচিত্রে বার্মাকে বলা হয়েছে ব্রেমালিমা, সিলেটকে সিরোট, কুমিল্লাকে কমোটেইল, কুচবিহারকে কসপেটার ইত্যাদি, সেহেতু আলীদমকে লোভাস ডোকাম বলা সম্ভব। মানচিত্রের দ্বারা অনুমিত হয়, লোভাস ডোকাম বা আলীকদম রাজ্যটি, বঙ্গোপসাগর উপকূল থেকে চীন পর্বত্যাঞ্চল পর্যন্ত শঙ্খ ও নাফের মধ্যাঞ্চল নিয়ে গঠিত যার শেষ পূর্ব ও উত্তর প্রান্তে অবস্থিত চাকোমা অঞ্চল। চাকমাদের ঐতিহাসিক কিংবদন্তি অনুযায়ী, আলীকদমে প্রাচীন দালানকোঠার ধ্বংসাশেষ বিদ্যমান থাকার কথা। অথচ চাকমারা পরিচয়ে অমুসলিম। আলীকদমকে তারা নিজেদের রাজ্য ও রাজধানী বলে দাবী করলেও, বারোজের বর্ণিত আলীকদমের অধিপতি খোদা বখশ খান, বা তদীয় বংশধরেরা চাকমা ইতিহাসে, তাদের রাজা বলে স্বীকৃত নন। যদিও মুসলিম নাম ও খেতাবধারী অনেক চাকমা রাজা রাণীর মত, বাস্তবে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত আরো অনেক চাকমা প্রধান ছিলেন বলে দাবী করা হয়।

চাকমা অধ্যুষিত কথিত তৈনছড়ি এলাকাটি এখানেই অবস্থিত। পন্ডিত বারোজের

বর্ণনাকে সম্প্রতি উদঘাটিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি, সম্পুর্ণ সত্য বলে স্বীকৃতী প্রদান করে। শত শত বছর আগের ঐ প্রজাদের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় হুবহু উদঘাটন বা নির্ণয় কঠিন হলেও, এখন তা আভাসে ইঙ্গিতে কল্পনীয়। নাম খেতাব ও রাজত্বের প্রতিনিধিত্ব গুণে, খোদা বখশ খান ও আলীকদম রাজ্যের চরিত্র খাটি মুসলিম। সোনার গাঁর মুসলিম সুলতান ফখরোদ্দিন মোবারক শাহই ১৩৪০ খ্রীঃ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামকে বাংলার মুসলিম রাজত্বভুক্ত করেন। ১৪৮৬খ্রীঃ সাল থেকে ২৬ বছর কাল তা পুনরায় আরাকানী মগ দখলাধীন থাকে। তৎপর তা ত্রিপুরার রাজা ধন্য মানিক্য কর্তৃক অধিকৃত হয়। যার দখল থেকে ১৫১২ খ্রীঃ সালে তা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ঐ গৌড় সুলতানাতের দখলাধীন চট্টগ্রামে, নিম্নোক্ত মুসলিম শাসনকর্তারা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, যথা ঃ

ক) মীরশ্বরাই অঞ্চল ঃ পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ

(খ) সীতাকুন্ড অঞ্চল ঃ হামিদ খাঁ।

(গ) ফতেহাবাদ অঞ্চল ঃ হামজা খাঁ।

(ঘ) দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ খোদা বখশ খাঁ।

সুত্র ঃ (১) চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গে ঃ জনাব আং হক চৌধুরী।

(২) চট্টগ্রামে ইসলাম ঃ ডঃ আং করিম, ইত্যাদি।

এখানে বারোজের বর্ননাভুক্ত খোদা বখশ খানের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ইতিহাস সোচ্চার। তিনি গৌড় সুলতানাতের অধীন দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা। বারোজের বর্ণনার মাধ্যমে আমরা সঠিকভাবে অবগত হচ্ছি যে, ঐ অঞ্চলের স্থানীয় নাম ছিল লোবাস ডোকাম, তথা আলীকদম। আলীকদম চাকমাদের একটি প্রাচীন রাজ্য এবং তার শাসনকর্তা তাদের রাজা হওয়ার দাবীর সমর্থনে, এখন বলা যায় যে, ওটা তাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে রাজ্য এবং খোদা বখশ খান বা তার বংশধরেরা তাদের জনপ্রিয় আশ্রয়দাতা হিসাবে রাজা সম্বোধিত হয়ে থাকবেন। এখানে ঐ রাজা প্রজাদের এক ধর্ম, এক সমাজ হওয়া অপরিহার্য নয়।

দ্রষ্টব্য ঃ জোয়াও ডে বারোজ অংকিত প্রাচীন মানচিত্র ঃ প্রথম খণ্ড শেষ পৃষ্ঠা

সুত্র ঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান ১৯৬৩, ডঃ আং করিম, খণ্ড-৩।

চাকমা লোকশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত ঐ চাকোমা অঞ্চলে তাদের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য মইসাগিরি, বা মনিজাগিরি অবস্থিত ছিলো বলে ধারণা করা যায়। উত্তর আরাকানে সম্ভবতঃ তাদের শক্তি ও সামর্থে সন্দিহান হয়ে, আরাকানী মগ রাজশক্তি ঐ চাকমা

জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করেন এবং তারই পরিণতিতে তারা বিপরীত দিকে অবস্থিত সুলতানী এলাকা আলীকদম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হোন। সেই মঘী আক্রমণ ও বিতাড়নের স্মারক হয়ে তাই আজো চাকমা সমাজে গীত হয়ে সেই বিখ্যাত চাকমা গানটি, যথা ঃ

'ঘরত গেলে মগে পায়

ঝাঁরত গেলে বাঘে খায়

বাঘে ন খেলে মগে পায়

মগে ন পেলে বাঘে খায়

এলে মৈসাং লালচ নেই

ন এলে মৈসাং কেলেচ নেই

চল ভেই লোগ চল যেই

চম্পক নগর ফিরি যেই।'

দ্বিতীয় বিবেচ্য প্রমাণ হলো ঃ আরাকানের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, তথাকার জনৈক রাজা মেংদি উত্তর আরাকানে অবস্থিত চাকমা অধ্যুষিত মইসাগিরি আক্রমন করে, চাকমা প্রধান, তার ছেলেমেয়ে স্ত্রী ও দশ হাজার প্রজাকে বন্দী করেন। (সূত্র মিঃ ফেইরকৃত হিষ্ট্রি অফ বার্মা, পৃ-৭৯)

তৃতীয় প্রমাণ হলো ১৭৮৭ সালে আরাকানের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত চিঠিতে কিছু চাকমা ও অন্যান্য পলাতকদের সে দেশের প্রজা হওয়ার দাবী এবং চর্তুথ প্রমাণ ১৮১৮ খ্রীঃ সালে, চাকমা সম্প্রদায়ভুক্ত আরাকানবাসী কিছু তঞ্চঙ্গ্যার, বাংলাদেশ অঞ্চলে আগমন ও আশ্রয় গ্রহণ। পঞ্চম প্রমাণঃ চাকমা রাজা শের জব্বার খাঁর সীলমোহর এবং ষষ্ঠ প্রমাণ ঃ তাদের রোসাংবাসী হওয়ার লোকগীতি মূলক স্বীকৃতি এবং সপ্তম প্রমাণ রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত দাবী ঃ বার্মা দেশে একটি চাকমা রাজ্য ছিলো। এ সবের মাঝে সর্ব প্রধান প্রত্যক্ষ প্রমাণ শের জব্বার খাঁর সীলমোহরটি, যাতে বলা আছে তিনি আরাকান বাসী ছিলেন। এই প্রমাণ সুত্রগুলোর ভিত্তিতে এটা নিঃসন্দেহ যে, উত্তর আরাকানে মইসাগিরি বা মনিজাগিরি বা অন্য নামীয় একটি চাকম্য অধ্যুষিত অঞ্চল অবশ্যই ছিলো।

তবে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হওয়ার পক্ষে প্রমাণযোগ্য মুদ্রা বা দলিলপত্র না থাকায়, কেবল সর্দার পরিচালিত একটি সম্প্রদায় হিসাবেই চাকমাদের কৌলিন্য স্বীকার্য।

বার্মা ও আরাকানে চাকমা অধিবাসের কথা সতীশ চন্দ্র ঘোষের চাকমা জাতি গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় নিম্নাকারে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

রাজা ইয়ংজ বা অরুণ যুগের রাজধানী ছিলো উচ্চ ব্রহ্মের মইসাগিরি নামক স্থানে, যার সাথে মগ রাজা মেংদিন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা অরুণ যুগ তিন রাণী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও দশ হাজার স্বজাতি প্রজা বন্দী এবং আরাকানে অন্তরীণ হোন। উক্ত বন্দী চাকমারাই তথায় দৈংনাক বা তঞ্চঙ্গ্যা নামে অভিহিত হোন।

আরাকানের দেঙ্গাওয়াদি আরেদ ফুং নামীয় কিংবদন্তিমূলক পুস্তকে উল্লেখ আছেঃ

যুবরাজ চজু, মধ্যম পুত্র চপ্রু, কনিষ্ঠ পুত্র চৌথু, তিন রাণী, দুই কন্যা, দাস দাবী আর দশ হাজার প্রজাসহ রাজা ইয়ংজকে বন্দী করা হয়। পঞ্চাশটি হাতি, কুড়িটি গয়াল, অজস্র স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি, রাজা মেংদির হস্তগত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র অংজাউর সাথে কনিষ্ঠ চাকমা রাজকন্যাকে বিবাহ দেয়া হয়। এবং রাজা মেংদি নিজের জন্য জ্যেষ্ঠা রাজ কন্যাকে রেখে দেন। বন্দী রাজপুত্রেরা বিশেষ তত্ত্বাবধানে থাকেন এবং বন্দী প্রজারা এংক্ষ্যং নামক স্থানে পুনর্বাসিত হোন।

ঐ বন্দী চাকমা রাজা, রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের নাম নিম্নরূপ বলে কারো কারো বর্ণনায় পাওয়া যায়।

মগ অভিহিত নাম ঃ	চাকমা অভিহিত নাম ঃ
রাজা ইয়ংজ	রাজা অরুণ যুগ
যুবরাজ চজু	সূর্যজিৎ
২য় পুত্র চপ্রু/চৌপ্রু	চন্দ্রজিৎ
৩য় পুত্র চৌথু ওরফে চান্দু থংজা	শক্রজিত ওরফে ঘাওটিয়া বা ঘাট্যা।
জ্যেষ্ঠা কন্যা চমিখা	সোনা বি
কনিষ্ঠা কন্যা চন্দ্রমুখী	মানিক বি

এখানে উল্লেখ্য যে, চাকমাদের নির্বাসন অঞ্চল এংক্ষ্যং প্রাচীন মানচিত্র অনুযায়ী মাতামুহুরী উপত্যকায়ই পড়ে।

ভৌগোলিক তথ্য ঃ

আলীকদম একটি থানা, আয়তন ৮৮১৮৯ বর্গকিলোমিটার জমি এক ফসলী ৬৮০০ একর, দু ফসলী ৩৪০০ একর, তিন ফসলী ১৮২০ একর, পতিত ২০২৮.৬০ একর, সেচযোগ্য ৮১৫ একর, খাস ২৮১২৫.৫৬ একর, বনভূমি ১৩৯৬০০ একর এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ১০৩০০০ একর।

জনসংখ্যা ঃ (আদমশুমারী ১৯৯১ খ্রীঃ) মোট ২৪০১৬ জন

১. মুসলিম বাঙালী	১১৫০৯ জন
২. হিন্দু বাঙালী	৯১৪ জন
৩. মগ বা মারমা	২৫৬৪ জন
৪. চাকমা	৩৭১ জন
৫. তঞ্চঙ্গ্যা	১০২৮ জন
৬. ত্রিপুরা	১৩৮৫ জন
৭. মুরুং	৬২৮৮ জন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ মাধ্যমিক ২টি, নিম্ন মাধ্যমিক ১টি, প্রাথমিক ২৩টি। শিক্ষার হার ২৪.০৭%।

৯. চাকমাদের রাঙ্গামাটি আগমন ও প্রাধান্য।

রাঙ্গামাটি নামের উৎসহলো ঃ স্থানীয় বেলে লাল মাটি। রাঙ্গামাটি সদরের পুর্বপাশে বর্তমানে হ্রদের পানিতে নিমজ্জিত এবং কর্ণফুলী নদীতে পতিত একটি পূর্বাগত ছড়ার নাম রাঙ্গামাটি ছড়া এবং পশ্চিমাগত আরেকটি ছড়ার নাম রাঙ্গাপানি ছড়া। এই দুই ছড়ার মোহনা ও কর্ণফুলী নদীর মুষ্ঠি সদৃশ বাঁক জুড়ে গড়ে ওঠা রাঙ্গামাটি শহরটি ছিলো আদতে অনাবাদী কিছু টিলার সমষ্টি। অতীত স্মৃতি কথা ও কাহিনীসুত্রে জানা যায় ঃ কেবল উত্তরের কাঁটা ছড়ি এলাকায়ই কুরাকুট্যা গোত্রভূক্ত কিছু চাকমার একটি বসতি ছিলো। দক্ষিণের ঝগড়াবিল এলাকায় ছিলো মুণ্ডশিকারী, কুকিদের আড্ডা। কুকিডর নামীয় বিভীষিকায়, চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নিজেদের পশ্চিমের পাহাড় বেষ্টনীয় বাহিরেই নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট থাকতো। ফলে আভ্যন্তরীন পাহাড়ঞ্চল ছিলো কুকিদের জন্য প্রায় মুক্তাঞ্চল।

বৃটিশ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধকালে, বিদ্রোহী চাকমা অভিজাতরা কুকিদের সাথে মৈত্রী গড়ে তুলেন। ফলে পরিবেশ কিছুটা কুকিডর মুক্ত হয়। রাজা জান বখশ খান, রাঙ্গামাটির খানেক উজানে চেঙ্গি মোহনা ও তার পাহাড়ী এলাকায় গড়ে তুলেন স্বীয় আস্তানা ও প্রতিরোধ ঘাঁটি। সম্ভবতঃ তখনই এই এলাকার নাম হয় হাজারী বাঁক এবং পাহাড়াভ্যন্তরের ঘাটিটি পরিচিত হয় কিল্লামুরা নামে। এই মোগলাই চরিত্র সম্পন্ন স্থানীয় নামগুলো এখনো নীরবে ধারণ করে আছে এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের স্মৃতি, যা মুসলিম বাঙালী ও অভিজাত চাকমাদের সাংস্কৃতিক একাত্মতার বাহক। সেই প্রথম মুসলিম বাঙালী ও অভিজাত চাকমাদের সাংস্কৃতিক একাত্মতার মিলক্ষেত্র। রাঙ্গামাটি ও তার আশপাশে সাধারণ চাকমা ও অন্যান্যদের বসতি বিস্তারের শুরু।

রাজা জান বখশ খাঁ আত্মসমর্পণ শেষে রাজা নগরবাসী হোন। তবে স্বীয় পুত্র যুবরাজ তব্বার খান, হাজারী বাঁকে-বসবাস অব্যাহত রাখেন। ওখানে কোন পাকা দালান বা স্থায়ী ইমারত গড়ে ওঠেনি। পিতার মৃত্যুর আগে পরে ১৭৯৮-১৮০১ এই তিন বছরই তিনি হয়তো রাজপদে আসীন ছিলেন। তৎপর তার তিরোধানে ভাই জব্বার খান ১৮০১ সালে রাজপদ লাভ করেন। তিনি ছিলেন নির্বিরোধ সৌখিন আয়েশী লোক। শিকার, ভ্রমণ, ভোগ-বিলাসিতা ও খাজনা উশোল উপলক্ষে প্রায়ই হাজারী বাঁকে আসা যাওয়াতে রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট হোন। তারই পছন্দের ভিত্তিতে বর্তমান জেলা প্রশাসকের বাংলার টিলায় একটি রেষ্ট হাউস কাম কাছারী ঘর নির্মিত হয়। এটি হয় হাজারী বাঁক আস্তানার বিকল্প। পরে ১৮৬৮ সালে প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইন এটিতে নব সৃষ্ট জেলার সদর দপ্তর স্থাপন করেন। পরিত্যক্ত হয় প্রথম স্থাপিত সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনা। তৎপর চাকমা রাজ কাছারী ও রেষ্ট হাউস নির্মিত হয় নদীর বিপরীত পাড়ের খানেক নীচে বালুখালিতে, নদীতীর সমতলে।

চাকমা ইতিহাসে বিস্তর বিভ্রান্তি, সামঞ্জস্যহীন কথা কাহিনীর উপস্থিতি, তার যথার্থতাকে সন্দেহপুর্ণ করে তুলেছে। মনে হয় এ হলো বিভিন্নজনদের উচ্চাকাঙ্খী সংযোজন ও অতিরঞ্জনের ফল। অথচ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ কথা কাহিনীর পরিমান ও কম নয়। তাদের কৌলিন্য ও গৌরবজনক অতীত প্রতিষ্ঠার জন্য সংযোজন ও অতিরঞ্জন মোটেও প্রয়োজনীয় নয়।

লোক কাহিনীর বর্ণনা মতে অভিযাত্রী যুবরাজের নাম হলো বিজয় গিরি, তদীয় ছোট ভাই উদয় গিরি ও পিতা রাজা সময় গিরি এবং সেনাপতি হলেন রাধা মোহন। কিন্তু রাজা ভুবন মোহন রায়ের বর্ণনায় দুই সহোদরের নাম ঠিক থাকলেও পিতার নাম সম্বুদ্ধ এবং রাধামোহন হলেন পরবর্তী নবম অধস্তন রাজপুরুষ সেরমাটিয়া বা শের মস্তের সেনাপতি। রাজা ভুবন মোহর রায় জনৈক শাক্য থেকে রাজতালিকা শুরু করেছেন। তদনুযায়ী ক্রমিক হিসাবে বর্তমানে মাননীয় দেবাশীষ রায় হোন ৪৮ তম রাজা। কিন্তু পরবর্তী কাহিনীকার ও লেখকদের অনেকে তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে রাজসংখ্যা দেখিয়েছেন ৬৫। কেউ কেউ আরো অতিরিক্ত ১৩ জনসহ যে সংখ্যা ধরেছেন সর্বমোট ৭৮ জন। নাম উপাধির ক্ষেত্রে বিস্তর অমিল ও বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি বিস্ময়কর হলো ঃ কল্পিতভাবে ঐ রাজাদের সময়কালটাও বর্ণিত হয়েছে, যার পক্ষে কোন প্রমাণের ধার ধারা হয়নি। নামগুলোর অধিকাংশ যে কাল্পনিত তার প্রমাণ হলো ঃ প্রথম১৪ জনের নাম অত্যন্ত সুন্দর ও ঝংকারময়। তৎপর মাদালিয়া, রামা থংজা, সের মাটিয়া, অরুণ যুগ, চান্দু থংজা, মাইসাং, মারিকিয়া, রদংছা, তিন সুরেশ্বরী, সাথুয়া ইত্যাদি। যেগুলোর বিকল্প হতে পারে যথাক্রমে আহমদ আলী, রহমান থংজা, শের মস্ত, হারুন শেখ, চাঁদ থংজা, মাহী শাহ, মালেক, রতন শাহ, তুন শের হাজারী বা তৈন শের আলী সাধু ইত্যাদি।

বর্ণিত লোকেরা যে ভারতীয় বংশোদ্ভুত, তার লক্ষণ হলো তাদের নাম উপাধির অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাজাত, এবং আদি বাসভূমি ও সে ভাষাতে পরিচিত। দীর্ঘ রাজ তালিকাটি যে আজগুবী তার প্রমাণ হলো ঃ সময়ের হিসাবে বর্ণিত ৭৮ পুরুষের কার্যকাল খৃষ্ট পূর্বাব্দে গিয়ে পৌছে। তা ছাড়াও যথার্থতার প্রমাণ নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। কোন প্রমাণের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে? প্রাচীনকাল থেকে এ তালিকা কি লিখিতভাবে সংরক্ষিত এবং তা কি প্রদর্শনযোগ্য? তালিকাটির ভাষা ও বর্ণই বা কি? এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীন চাকমা ভাষা ও লিপি ধারা প্রমাণ করে ঃ সর্বপ্রাচীন নিদর্শণ হলো ঃ সীলমোহরে ব্যবহৃত আরবী ভাষা ও বর্ণ, তৎপর খেমার বর্ণ ও আঞ্চলিক বাংলা যা তন্ত্রমন্ত্র ধর্মীয় শ্লোক ও গোজনের লামায় ব্যবহৃত এবং সর্বশেষ বাংলা বর্ণ ও ভাষা ব্যবহারের নমুনা হলো কালিন্দি রাণীর সীলমোহর ও মন্দির গাত্রের বাণী। রাজতালিকাটি যদি খাটি হয় তবে তা এই ভাষা ও বর্ণ ধারায় অথবা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি ও ভাষায় লিখিত থাকতে পারতো, যা আমার মনে হয় অসম্ভব নয়। সুতরাং বর্ণিত দীর্ঘ রাজতালিকাটিও তাদের লেখ শৈলী বাস্তবিকই প্রশ্ন সাপেক্ষ আজগুবী। দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসেও চাকমা পন্ডিতজন রং চড়িয়েছেন। নিজেদের সীলমোহরের দ্বারা যে চাকমা প্রধানরা সুপ্রতিষ্ঠিত তাও অতিরঞ্জন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা পায় নি। বলা হয়ে থাকে, যুদ্ধে জয়ী হয়ে মোগলদের হাত থেকে দু'টি কামান দখল করা হয়, যার একটি ফতেহ খাঁ নামে এখনো রাঙ্গামাটি রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে ও প্রদর্শিত হয়। অথচ স্বীয় সীলমোহর সুত্রে ফতেহ খাঁ অকাট্যভাবেই বৃটিশ আমলের লোক। তিনি ১৭৭১ থেকে ১৭৭৩ সাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় কোন ফতেহ খাঁর থাকাও সমর্থিত নয়। এই অকাট্য প্রমাণ সুত্রেই বলা যায় ঃ মোগলদের সাথে তার যুদ্ধ করা ও কামান দখল ভুয়া। রাঙ্গামাটির আগে এ কামনটি রাজানগর ও রাজভিলায় ছিলো, তার ও কোন প্রমাণ নেই। এটির বর্ণনা কেবল রাজা ভুবন মোহন রায়ই ব্যক্ত করেছেন। সুত্র সম্বন্ধ ও প্রমাণহীন এই কামানটি সম্ভবত পরিত্যক্ত অবস্থা থেকে তিনি নিজে উদ্ধার করে রাঙ্গামাটির পাকা রাজবাড়ী প্রাঙ্গনে স্থাপন করে থাকবেন। ত্রিপুরা রোসাং ও মোগল শক্তির পারস্পরিক যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও এরূপ কোন কামানের পরিত্যক্ত থাকা অসম্ভব নয়। তাই দখলের সন তারিখসহ ইংলিশ ভাষ্য সহ এটি প্রদর্শন অগৌবরের বিষয়।

উল্লেখিত হয় ঃ রাজা মোগল বা মোগল্যার পুত্রই জুবাল খাঁ ওরফে জালাল খাঁ। তিনি জুমকর দিতে অস্বীকার করার বিদ্রোহজনিত কারণে, মোগল এলাকা থেকে আরাকানে বিতাড়িত হোন। জালাল খাঁ হলেন ঃ ভিন্ন স্বল্পকালীন রাজগোষ্ঠী, চন্দন খাঁ ওরফে তৈন খাঁ বংশের শেষ ব্যক্তি যার পিতার নাম হলো কুত্তুয়া। তিনি স্ববংশে ও স্বদলে, দোহাজারীর মোগল ফৌজদার কিষণ চাঁদ কর্তৃক ১৭২৪ স্বদলে আক্রান্ত ও আরাকানে বিতাড়িন হোন। এই চন্দন খাঁ বংশের বিতাড়িত বিদ্রোহী জালাল খাঁর ছেলে রূপে ফতেহ খাঁর ঐ সময়ে ক্ষমতাসীন হওয়া অবিশ্বাস্য। তার সীলমোহরটিও

এই সময়কালকে সমর্থন করে না। সুতরাং এ বলা অত্যুক্তি নয় যে, চাকমা ইতিহাসের অনেকটাই অতিরঞ্জিত ও সংযোজিত। প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে তাতে কাটছাট হওয়া আবশ্যক। এরূপ করা হলে একটি উজ্জ্বল আবর্জনামুক্ত সঠিক অতীত ফুটে উঠবে, যা হবে যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। চাকমাদের একটি গৌরবজনক অতীত অবশ্যই আছে। তবে তা উদ্ধারের প্রক্রিয়া হতে হবে যুক্তি ও বাস্তবতা ভিত্তিক। উচ্ছ্বাস, রূপকথা ও অতিকথনকে বাদ না দিলে, এটি কখনো বিশ্বাস্য রূপ পাবে না। রূপকথার রাজা উজির হয়ে লাভ নেই। বাস্তবে অভিজাত ও কুলিন হওয়াটাই যথার্থ।

প্রমাণ, স্মৃতি নির্দশন, লোকগীতি ও স্মৃতি কথার মাধ্যমে অধুনা প্রাপ্ত বিশ্বাসযোগ্য চাকমা ইতিহাস, কম গৌরবজনক নয়। এই ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন না হলেও, রোসাং ও মোগল আমল পর্যন্ত প্রামাণ্য আর বিস্তৃত। তবে চাকমা ভাষা ও শ্রুতিকে বিশ্লেষণ করা হলে, এমন সব বিশ্বাসযোগ্য অনুসিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব, যা তাদেরকে প্রাচীন মগধ রাজ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে। এর অর্থ হলো ঃ এরা অবশ্যই একটি কুলিন সম্প্রদায়, যাদের পুর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিলো বিহার ও নেপালের সীমান্তবর্তী প্রাচীন ভারত ভূমি, যে এলাকাটি ছিলো স্বশাসিত। সম্ভবতঃ এলাকাটির কেন্দ্রভূমির নাম ছিলো চম্পক নগর। ঐ স্বশাসিত চাকমা অঞ্চল মগধ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হওয়ার সুত্রেই পূর্ব দক্ষিণ দিকে তাদের দেশান্তর ঘটে। ঐ ঘটনারই স্মারক কটুবাক্য হলো ঃ মগধা। যেমন ঃ বাঙালীদের কাছে অত্যাচারী মারাঠীরা বর্গী, আরাকানী দস্যুরা মগ ও লূটেরা পর্তুগীজেরা হার্মাদ নামের কটু বিশেষণে ভূষিত। অনুরূপ কটু বিশেষণ হলো, চাকমাদের ঘৃণিত-জন মগধবাসী মগধা।

আমার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক সুত্র হলো ঃ চাকমা ভাষা হিন্দী, মাগধী ও ভাওয়াইয়া চরিত্র ও শব্দাবলী সমৃদ্ধ ও স্থান পরিচয়ের সাথে তাদের নগর শব্দের প্রয়োগ, যথা ঃ বিহারের ভাটনগর, জাজনগর ও দক্ষিণ-পূর্ব নেপালের বৈরাট নগর, যে নামের সাথে সঙ্গতিপুর্ণ প্রাচীন চাকমা ভূমির নামঃ কল্পনগর ও চম্পক নগর। ভাষাগত একাত্মতার নমুনা হলো হিন্দি-ইধার, চাকমা-ইধু, ভাওয়াইয়া যেবং চাকমা যেবং মাগধী কবাল, চাকমাঃ কবাল হিন্দি লোগ চাকমা লোগ হিন্দি বহুবচন হাম চাকমা বহুবচন আমি হিন্দিতে ক্রিয়া পদের পূর্বে না বসে চাকমাতেও তাই, ইত্যাদি।

রাজা ভুবন মোহন রায় স্বীয় পুস্তিকা ঃ চাকমা রাজপরিবারের ইতিহাসে বলেন ঃ চাকমা যুবরাজ বিজয় গিরি দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে তেওয়া নদী হয়ে, ছয় দিবা রাত্রের যাত্রা শেষে, কালাবাঘা অঞ্চলে এসে, অবতরণ করেন। তৎপর ঐ অভিযাত্রী দল ক্রমান্বয়ে খৈ গাং, ত্রিপুরা, মেঘনা দৈর্য্যা ও চাটিগাং পাড়ি দিয়ে, অক্সাদেশ বা আরাকান জয় করেন।

এই কাহিনীর দ্বারা একটি যাত্রাপথ ও আদি চাকমা বাস ও অবস্থান নির্ণিত হয়।

তেওয়া মানে হাল আমলের করতোয়া নদী। কালাবাঘা মানে, ঐ নদী মোহনার নিকটকার বাঘা অঞ্চল। খৈ গাং মানে হবিগঞ্জ ও ত্রিপুরাভেদী খোয়াই নদী। তৎপর ত্রিপুরা, মেঘনা দরিয়া ও চাটিগাং তো হুবহু অবিকৃতই আছে। এই যাত্রাপথের মাথায়, উত্তর পশ্চিমে বিহার ও নেপালের সীমান্তবর্তী হিমালয় পাদদেশ। ঐ জায়গাটির ভাষা হলো ঃ হিন্দি, মাগধী, নেপালী ও ভাওয়াইয়া মিশ্রিত। ঐ জায়গায় চম্পা নগর নামীয় একটি এলাকা আছে। ইতিহাসের বর্ননায় যেখানে মারাঠাদের সাথে আলীবর্দী খাঁর সৈন্য ও ইংরেজ পক্ষের সাথে, মীর কাসেম আলী খান পক্ষীয়দের যুদ্ধ হয়েছে। সম্ভবতঃ ঐ চম্পাই চম্পক নগর। এভাবে বর্ণিত তথ্য সুত্রাদি ধরে গবেষণা করা হলে চাকমা ইতিহাসের অজানা প্রাচীন অধ্যায় নির্ণয় অবশ্যই সম্ভব।

কিন্তু এই মূল্যবান তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা কাজটি বাঙালী অবাঙালী সব পন্ডিতের দ্বারাই উপেক্ষিত। খোদ চাকমা পণ্ডিতরাও অতীত রূপকথার উচ্ছাসে আবদ্ধ হয়ে আছেন। রূপকথার আবেষ্টনমুক্ত এক গৌরবজনক ইতিহাস উদ্ধারের পক্ষে, বহু প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা সত্ত্বেও, তাকে আবর্জনামুক্ত করে, বিশ্বাস্য রূপদানে, কেউ সচেষ্ট নন। আমি সীমিতভাবে তার কিছু চর্চা করি, কিন্তু বাঙালী হওয়ার গুণে অনেকেই আমার প্রতি সন্ধিগ্ধ। তবু আমি একদিন তাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবো সে আশা রাখি। আমি বিশ্বাস করি আমার হাতে রক্ষিত তথ্য সুত্র গুলো ও তার গবেষণার ফল, কোন একদিন, গৌরবজনক চাকমা অতীতকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যদিও আমার জীবিতকালে তা হওয়া অনিশ্চিত। আমার গবেষণা পত্রটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়াটাও অর্থ সংকটে আবদ্ধ। তা কীটদষ্ট হবে, না কাজে লাগবে, জানি না। তবে আশায় আশায় যক্ষের ধনের মত পাণ্ডুলিপিগুলো আগলে রেখেছি। তবু কিছু কিছু কীট দষ্ট হয়েছে। এই গবেষণায় আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ

ক) চাকমারা প্রাচীন ভারতীয় এক সম্ভ্রান্ত জনগোষ্ঠী।

খ) তাদের মূল আবাসভূমি চম্পক নগর হলো, উত্তর পূর্ব বিহারের প্রাচীন চম্পা অঞ্চল।

গ) চাংমা, সাঙমা ও চাকেরা একই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লোক।

ঘ) চাকমা চাঙমা ও সাংমা নাম রহস্যের সাঙমাই মূল নাম।

চ) চাকমারা এককালে আরাকানে অভিবাসী ছিলো। মগ বৈরীতাই তাদেরকে বাংলাদেশের দিকে তাড়িত করেছে।

ছ) চাকমারা কয়েক শত বছরের বিবর্তিত জাতি।

যে তথ্য সুত্র ও উপদানগুলো আমার গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং যা অন্যান্য গবেষকদের সহায়ক হবে, তা হলো ঃ

পার্বত্য তথ্য কোষ

১। রাধামোহন ধনপতি ও আরাকানী দান্যাওয়াদি আরেদফুং পালা। চাটিংগাং ছড়া/ছাড়া পালা যা প্রথমটির অংশ। সামান্য কিছু অংশ ছাড়া এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত নেই। চাকমা চারণ গায়ক গেংকুলিরাই তার মৌখিক ধারক। আমার ধারণা দান্যাওয়াদি আরেদফুং ধনপতি রাধা মোহনেরই মঘী ভাষ্য। তা ঐ ভাষায় মুদ্রিত পাওয়া যায়। মঘী পাঠ ও ভাষা জ্ঞান থাকা, তার মর্মোদ্ধারের পক্ষে জরুরী।

২। চাকমাদের মাঝে প্রচলিত অন্যান্য লোকগীতি, লোক কাহিনী ও বারমাসী।

৩। চাকমা ভাষা ও প্রবচন।

৪। চাকমা নাম উপাধি ঐতিহ্য ও আচরণের প্রাচীন উদাহরণ।

৫। চাকমা গোত্র গোষ্ঠীর তালিকা।

৬। চাকমা রাজপুরুষ ও পন্ডিতদের লিখিত বিবরণ।

৭। বৃটিশ প্রশাসক ও ইউরোপিয়ান পন্ডিতদের লিখিত বিবরণ।

৮। চাকমা রাজবাড়ীতে রক্ষিত প্রাচীন রাজকীয় সীলমোহর, দলিল পত্র সাজ-পোষক।

৯। বৃটিশ ও বার্মা সরকারের সীমান্ত ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত পরস্পরকে প্রদত্ত চিঠি পত্র।

১০। রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চট্টগ্রাম ভিত্তিক পুরাতন তথ্য পত্রাদি।

১১। আরাকানের রাজা ও বার্মার সম্রাট কর্তৃক ১৭৮৭ সালে চট্টগ্রামের বৃটিশ প্রশাসককে লিখিত চিঠি।

১২। প্রত্নরহস্য ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য।

১৩। ভাষা ও লিপি জ্ঞান, যথা ঃ ইংলিশ, আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি, মাগধী আঞ্চলিকসহ, বাংলা ও মঘী ভাষা।

১৪। প্রাচীন ভারতের নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস।

১৫। প্রাচীন ও বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলের লোক বসতির ইতিহাস।

১৬। ভারতীয়দের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ধর্মপ্রচার, উপনিবেশ স্থাপন ও অভিবাসন গ্রহণমূলক তথ্য।

১৭। বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও খ্রীষ্ট ধর্মীয় সম্প্রসারণের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মুখী অভিযান ও তৎপরতা।

১৮। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ ও পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন।

১৯। তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ ও সংশোধনী ১৯৯৮।

২০। পার্বত্য শান্তিচুক্তি ১৯৯৭।

২১। জনসংহতি সমিতির দাবীনামা।

এই তালিকায় আরো অনেক সুত্র যোগ করা সম্ভব। উপজাতীয় পন্ডিতরা এই কষ্টসাধ্য অধ্যায়ন ও গবেষণায় ব্রতী হলে, এতদাঞ্চলীয় ইতিহাস উপকৃত হতো। কিন্তু তাদের অধিকাংশ কেবল লোককথা ভিত্তিক চর্বিত চর্বন নিয়েই ব্যস্ত এবং কেউ কেউ এ প্রমাণে ও সচেষ্ট যে, তাদের পূর্বপুরুষরা কোন প্রমাণ ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতঃসিদ্ধ রাজা উজির ছিলেন। তারা ভুলে যান ঃ এটি হলো বৃহত্তর চট্টগ্রামের অংশ, যার একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস আছে। অস্ত্র আর গলাবাজিতে অতীত রচিত হয় না। ইতিহাসের গৌরবে শরিক হতে হলে, নিজের উপস্থিতি ও অংশীদারিত্ব যৌক্তিকভাবেই প্রমাণ করতে হবে। তার উপায় আজগুবী কাহিনী রচনা ও উপস্থাপন নয়। চাকমা রাজা ৪৮ বা ৭৮ জন এ দাবী উপহাস্য।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃহত্তম চট্টগ্রামেরই ভৌগোলিক অংশ। এবং চট্টগ্রাম আবহকালীন বাংলার ঐতিহাসিক ভূখন্ড। অতীতে ত্রিপুরা ও রোসাং রাজ্যের হাতে এতদাঞ্চলের অধিকারের বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়েছে। কিন্তু ১৬৬৬ সালে মোগল দখলের পর চিরস্থায়ীভাবে ত্রিপুরা ও রোসাং শাসনের অবসান হয়। আদিকাল থেকেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের মূল বাসিন্দা হলো চট্টগ্রামী বাঙালীরা। তবে এর পূর্বপ্রান্তিক বন সমৃদ্ধ পাহাড়াঞ্চল চিরকালই ছিলো লোক বসতি হীন অনাবাদী খাস। সীমান্তের অরাজক, কুকি, লুসাই, সেন্দু, চীন ইত্যাদি নামীয় উপজাতিরা ঐ খাস পাহাড় বনে অনুপ্রবেশ করে মৌসুমী জুম চাষে লিপ্ত হতো এবং ফসল তোলার পর আবার তাদের স্বস্থানে ফিরে যেতো। তারা ছিলো ভ্রাম্যমান বহিরাঞ্চলবাসী লোক। মোগল আমলে ঐ ভ্রাম্যমান বিদেশীদের কাছ থেকে নগদে ও তুলায় জুম খেরাজ বা জুম খাজনা আদায় করা হতো। তখনকার রাজস্ব সংজ্ঞায় জুম চাষযোগ্য পার্বত্য পূর্বাঞ্চলকে বলা হতো জুম বঙ্গ এবং জুম চাষ অনুমতিকে বলা হতো জুম নোয়াবাদ। জুমবঙ্গ খণ্ড খণ্ড অঞ্চলে বিভক্ত এবং জুমচাষ হতো ভ্রাম্যমান। কার্পাস তুলা চাষাধীন জুম ক্ষেত্রগুলোকে বলা হতো কাপাস মহাল। চাষীদের তুলা সরবরাহের অঙ্গীকারে জুম করতে দেয়া হতো এবং এই সরবরাহকে নিশ্চিত করতে জুমিয়া সর্দারদের জামিনদার অথবা ইজারাদার নিযুক্ত করা হতো। অনেক সময় স্থানীয় প্রভাবশালী বাঙালীরাও ইজারাদার নিযুক্ত হতেন।

প্রথমে শঙ্খনদী সীমা পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলই মোগলদের দখলাধীন হয় এবং তা-ই জুমবঙ্গরূপে মর্যাদা লাভ করে, যার পূর্ব সীমানা হলো ঠেকা নদী এবং উত্তর সীমা ফেনী নদী হয়ে বেতলিং। পরে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছরে ধীরে ধীরে নাফ

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮